International Economic Relations

[সিলেবাস: International Trade, free trade, protectionism, foreign aid, debt crisis, foreign direct investment, financial liberalization, regionalism, regionalisation, north-south gap, global poverty, MDGs]

অনুসরণীয়: এই অধ্যায়টিও Actors in the World, Power & Security চ্যাপ্টারের মত গুরুত্বপূর্ণ। গত ৬টি প্রিলিতে প্রায় ১৩টি রিটেনে প্রশ্ন এসছে। প্রার্থীদের প্রতি অনুরোধ থাকবে অবশ্যই ২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় তিনটি গুরুত্ব দিয়ে শেষ করবেন।

বিগত প্রশ্ন:

৪১তম ও ৩৮তম: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে most favoured nation বলতে কী বুঝায়?

Most-favoured-nation (MFN) নীতি হলো আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ চুক্তির একটি মূল উপাদান। একটি দেশ অন্য দেশের বিনিয়োগকারীদের সাথে অন্য কোন বিদেশি দেশের বিনিয়োগকারীদের চেয়ে কম সুবিধাজনক আচরণ করবে না। এ নীতি বিনিয়োগকারীদের আয়োজক দেশগুলোর দ্বারা নির্দিষ্ট ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি গ্যারান্টি দেয় এবং এটি বিভিন্ন বিদেশি দেশের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি করা চামড়ার গ্লাভসের উপর ১৩ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। Most-favoured-nation স্ট্যাটাসের অর্থ হল ফ্রান্স, চীন, ব্রাজিল এবং রাশিয়া থেকে আমদানি করা গ্লাভসের উপরে একই হারে কর দিতে হবে। Most-favoured-nation স্ট্যাটাস বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য একটি বেসলাইন, এটি নিশ্চিত করে যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে থাকা দেশগুলোর সঙ্গে একই রকম আচরণ করা হয়। যদিও কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই মর্যাদা পাওয়ার পর সব দেশ একে অপরের সঙ্গে কোনও বৈষম্য ছাড়াই সহজে ব্যবসা করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, ভারত তার সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য শ্রীলঙ্কাকে কিছু বিশেষ সুবিধা প্রদান করে, তাহলে তাকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যান্য সদস্যদেরও একই সুবিধা প্রদান করতে হবে। একইভাবে ভারতকেও অন্যান্য দেশ বিশেষ ছাড় দেবে।

WTO'র চুক্তির অধীনে, দেশগুলো সাধারণত তাদের বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে বৈষম্য করতে পারে না। কাউকে একটি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করলে অন্য সকল সদস্যদের জন্য একই কাজ করতে হবে। এই নীতিটি MFN নামে পরিচিত। তবে এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম অনুমোদিত। উদাহরণস্বরূপ, দেশগুলো একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) স্থাপন করতে পারে যা শুধু গ্রুপের মধ্যে বাণিজ্য করা পণ্যগুলোর জন্য প্রযোজ্য।

কিন্তু চুক্তিগুলো শুধুমাত্র কঠোর শর্তে এই ব্যতিক্রমগুলোকে অনুমতি দেয়। সাধারণভাবে, MFN এর অর্থ হলো যে যখনই একটি দেশ একটি বাণিজ্য বাধা কমায় বা একটি বাজার উন্মুক্ত করে, তখন এটিকে তার সমস্ত বাণিজ্যিক অংশীদারদের কাছ থেকে একই পণ্য বা পরিষেবাগুলোর জন্য তা করতে হবে - ধনী বা দরিদ্র, দুর্বল বা শক্তিশালী নির্বিশেষে।

'MFN নীতি' যদিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে সহায়তা করে, তবুও GATT এবং UNCTAD মনে করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য এ ধারণার নিয়মনীতিগুলো শিথিল করা উচিত। এছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্লক, যেমন: ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নাফটা ইত্যাদি 'সর্বাধিক পছন্দসই রাষ্ট্র' ধারণার বিপরীত এবং একই সাথে উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য বাণিজ্য নীতি শিথিল করা হচ্ছে না। তাই, 'MFN নীতি'র সংশোধন জরুরি।

৪০তম: চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [**]

২০১৫ সালে Schwab `Foreign Affairs' আর্টিকেলে এবং *The Fourth Industrial Revolution* গ্রন্থে 'চতুর্থ শিপ্লব বিপ্লব' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি এর বিষয়বস্তুতে বলেছেন,

> "চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হলো ডিজিটাল প্রযুক্তির নিত্য নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে 'উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা"

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অপর নাম 'ডিজিটাল বিপ্লব'। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আক্ষরিক অর্থে পরিণত হবে বিশ্বগ্রামে। পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করবে প্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতি। এ সম্পর্কে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি স্থানান্তর বিশেষজ্ঞ (innovation and digital transformation) টম গুডউইন (Tom Goodwin) বলেন–

১. বিশ্বের সবচেয়ে বড় ট্যাক্সি কোম্পানি উবারের কোনো ট্যাক্সি নাই

২. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিডিয়া ফেসবুক নিজে কোনো কনটেন্ট তৈরি করে না
৩. পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাইকার আলিবাবার কোনো গুদাম নাই
৪. বিশ্বের সবচেয়ে বড় আবাসন প্রভাইডার Airbnb এর নিজেদের কোনো রিয়েল স্টেট নেই।"

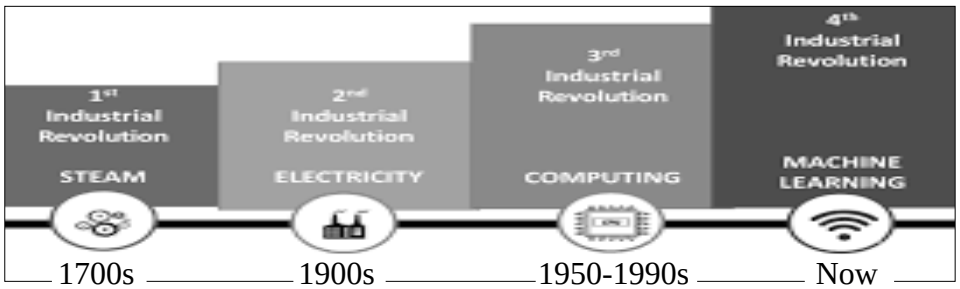

উদাহরণ: স্মার্ট ফোন, রোবটিকস, আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, ন্যানো-টেকনোলোজি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বায়োটেকনোলজি, ইন্টারনেট অব থিংকস, ডিসেন্ট্রালাইজড কনসেনসাস, ফিফথ-জেনারেশন ওয়ারলেস টেকনোলোজিস, ৫-জি প্রভৃতি।

ফলাফল:

- বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে ৩৮-৪৭%, জার্মানিতে ৩৫%, যুক্তরাজ্যে ৩০% এবং জাপানে ২১% কর্মী কর্মসংস্থান হারাবে।
- দক্ষ জনশক্তির অভাব দেখা দিতে পারে।
- অনুন্নত বিশ্ব আরো পিছিয়ে যেতে পারে।
- প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে অনেক দেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে।
- Dutch Disease এর শিকার হতে পারে বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো।

৪০তম: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

WTO এর ১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে Dispute Settlement Appellate Body - ৩ জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত। এই অঙ্গটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিরোধ নিষ্পত্তিতে কাজ করে থাকে।

প্রথমত : সব দেশ আপত্তি/Veto দিতে পারবে।
দ্বিতীয়ত : কোনো দেশ কোনো বিধি ভঙ্গ করলে অন্য যে কোনো দেশ WTO তে অভিযোগ করতে পারবে।
তৃতীয়ত : অভিযোগ আলোচনায় সমাধান না হলে Pannel (প্যানেল) গঠিত হবে।
চতুর্থত : প্যানেল পর্যালোচনা করে সুপারিশ দিবে ।
পঞ্চমত : সুপারিশ পছন্দ না হলে Dispute Settlement Appellate Body তে আপিল করা যাবে
সর্বশেষ : Dispute Settlement Body যে রায় দিবে তা বাধ্যবাধকতা হবে।

৪০তম: ট্র্যান্সআটলান্টিক (transatlantic) সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [**]

TTIP বা Trans Atlantic Trade and Investment Partnership হলো বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এটি হলো যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আলোচনা। এখানে আলোচিত বিষয়কে এড্রেস করা হয় Except Military Issue হিসেবে। মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই আটলান্টিক আলোচনা স্থগিত রেখেছিল।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ২০২২ সালের মার্চ মাসে জার্মান অর্থমন্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান লিন্ডার টিটিআইপি আলোচনা পুনরায় শুরুর আহ্বান জানান। তিনি বলেন,"আমাদের উচিত একটি ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা পুনরায় শুরু করা। বিশেষ করে ইউক্রেন সংকটে, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে সারা বিশ্বের অংশীদারদের সাথে মুক্ত বাণিজ্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।"

তবে যুক্তরাষ্ট্র জার্মান অর্থমন্ত্রীর এ আহ্বানে ইতিবাচক কোনো সাড়া দেয়নি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশগুলোও কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

৪০তম: আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ফাংশনালিজম (functionalism) তত্ত্বের গুরুত্ব কী?

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে Functionalism সর্বপ্রথম ধারণা দেন Paul Samuel Reinsch. এই তত্ত্বে পক্ষসমূহ অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল না হয়ে কোন একটি কাজ সম্পাদনের জন্য একত্রিত হয়ে থাকে। আঞ্চলিক না হয়েও পক্ষসমূহ অঞ্চলের মত আচরণ করে থাকে। অর্থাৎ সদস্যসমূহ আঞ্চলিকীকরণকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

উদাহরণ:

- ধর্মের ক্ষেত্রে - OIC, SLA.
- অর্থনীতির ক্ষেত্রে - BRICS, G-7, D-8, G-20
- রাজনীতির ক্ষেত্রে - NAM, Commonwealth, Arab League
- খেলাধুলার ক্ষেত্রে - ICC, IOC, FIFA.
- বাণিজ্যের ক্ষেত্রে - OPEC, GCEF.

৩৭তম: আঞ্চলিক [আঞ্চলিকতাবাদ] ও আঞ্চলিকরণের [আঞ্চলিকীকরণের] মধ্যে পার্থক্য কী? [***]

রাষ্ট্র তার প্রয়োজনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা পরিবেশগত প্রভৃতি জোটে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে বললে অঞ্চলকেন্দ্রিক জোট হলে তা আঞ্চলিকতাবাদ আর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের আলোকে হলে তা আঞ্চলিকীকরণ। এদের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

আঞ্চলিক/ আঞ্চলিকতাবাদ	আঞ্চলিকীকরণ
এটি একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ যা একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থের ওপর আলোকপাত করে।	এটির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বা মানবিক চাহিদা ফুটে ওঠে।
রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হতে অঞ্চল বা ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটকে প্রাধান্য দিলে তা হয় আঞ্চলিকতাবাদ।	রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হতে অঞ্চল বা ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটকে প্রাধান্য না দিয়ে, প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিলে তা হয় আঞ্চলিকীকরণ।
SAARC, ASEAN, BIMSTEC, APEC, TPP, NATO, IAS, EU, OAU, GCC প্রভৃতি আঞ্চলিকতাবাদের উদাহরণ	BRICS, ICC, FIFA, OIC, NAM, Arab League, Red Cross, G7, OPEC প্রভৃতি আঞ্চলিকীকরণের উদাহরণ।
উদাহরণে দেখা যায়, রাষ্ট্র ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিকভাবে জোটবদ্ধ হয়েছে।	উদাহরণে দেখা যায়, রাষ্ট্র প্রয়োজনের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়ভাবে জোটবদ্ধ হয়েছে।
আঞ্চলিকতাবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ও জাতীয়তা-বাদের ধারণা পাওয়া যায়।	আঞ্চলিকীকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ধরন, বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৩৭তম: সহস্রাব্দ উন্নয়ন Millennium Development এবং ধারণযোগ্য উন্নয়ন Sustained Development বিষয়ে ধারণা দিন (সংক্ষেপে)। [***]

জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা UNDP কর্তৃক গৃহীত দুটি উন্নয়ন প্রকল্প হলো সহস্রাব্দ উন্নয়ন (Millennium Development) ও ধারণযোগ্য বা টেকসই উন্নয়ন (Sustained Development)। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন এবং ২০১৬ সালে ধারণাযোগ্য উন্নয়নের বিষয়ে পৃথক দুটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও ধারণযোগ্য উন্নয়নের তুলনামূলক আলোচনা:

১. একুশ শতকের পৃথিবী কিরূপ হতে পারে এমন একটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো সহস্রাব্দ উন্নয়ন। অপরদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের কথা বিবেচনা করে মানবিক উন্নয়ন বজায় রাখা হলো টেকসই উন্নয়ন।

২. সহস্রাব্দ উন্নয়ন ছিল স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য, যেখানে উন্নত বিশ্ব LDC ভুক্ত দেশগুলোকে সাহায্য করবে এমন প্রতিশ্রুতি ছিল। অপরদিকে, টেকসই উন্নয়ন হলো সব দেশের জন্য। এখানে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশ তার অবস্থান অনুযায়ী পৃথক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। অর্থাৎ, MDGs for LDCs & SDGs for All.

৩. সহস্রাব্দ উন্নয়নের আনুষ্ঠানিক নাম হলো "We the people: The Role of the United Nations in the Twenty-First Century". অপরদিকে ধারণযোগ্য উন্নয়নের আনুষ্ঠানিক নাম হলো "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" বা Agenda: 2030.

৪. Millennium Development হলো গরিব দেশগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন। আর Sustained Development হলো মানুষ ও পৃথিবীর উন্নয়ন।

৫. মিলেনিয়াম উন্নয়নে সকল সমস্যা হ্রাস করা বা সকল সম্ভাবনার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি থাকে। অপরদিকে, টেকসই উন্নয়নে সমস্যা দূর করা বা সকল সম্ভাবনার শতভাগ অর্জনের প্রতিশ্রুতি থাকে।

৬. ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে মিলেনিয়াম সম্মেলন হয়। অপরদিকে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সম্মেলন হয় ২০১৫ সালের ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর।

৭. মিলেনিয়াম উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮টি এবং টার্গেট ছিল ২১টি। অপরদিকে, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ১৭টি এবং টার্গেট হলো ১৬৯টি।

৮. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষতি না করে বর্তমান প্রজন্মের উন্নয়নই টেকসই উন্নয়ন। অপরদিকে, স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নই ছিলো সহস্রাব্দ উন্নয়ন।

৩৬তম: BRICS কী? [**]

পাঁচটি বৃহৎ অর্থনীতির দেশ Brazil, Russia, India, China, South Africa এর অর্থনৈতিক জোট হলো ব্রিকস BRICS. ২০০১ সালে Goldman Sachs এর চেয়ারম্যান জিম'ও নিল উদীয়মান অর্থনীতির ৪টি দেশ যথা: ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনকে BRIC হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এরপর ২০০৬ সালে উক্ত ৪ দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একটি বৈঠকে মিলিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে BRIC সামিটের মাধ্যমে (BRIC নামের) সংগঠনটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ২০১১ সালে সংগঠনটির সদস্য হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা যোগ দেওয়ায় এর সদস্য সংখ্যা হয় ৫ এবং নতুন নাম হয় BRICS। ব্রিকসের দেশগুলো ২০১৪ সালে *New Development Bank* নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো অবকাঠামোগত প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা। অর্থনৈতিক জোট হিসেবে ব্রিকস এর সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ব্রিকস সদস্য দেশগুলোর এ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তারে নেতৃত্ব দানে সহায়তা করবে। ব্রিকসের অবস্থান বিশ্বরাজনীতিতে যেভাবে সুদৃঢ় হচ্ছে তাতে বিশ্বরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের একক কর্তৃত্ব হ্রাস পাবে। এর ফলে বিশ্ববাজারে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দখলদারিত্ব কমে যাবে, ডলার ও ইউরোর আধিপত্য হ্রাস পাবে।

এক নজরে ব্রিকসভুক্ত ৫টি দেশ:

আয়তনে বিশ্বের	: ২৭%
জনসংখ্যায় বিশ্বের	: ৪০% (৩.৪১ বিলিয়ন)
উৎপাদনে বিশ্বের	: ২৩.২% (১৮.৬ ট্রিলিয়ন)
জিডিপিতে বিশ্বের (পিপিপি)	: ৩২% (৪০.৫৫ ট্রিলিয়ন)
২০৩০ সালে বিশ্ব মূলধনের	: ৫০ শতাংশের মালিক হবে ব্রিকস

[সূত্র: IMF এর অর্থনৈতিক রিপোর্ট, ২০১৮]

৩৬তম ও ৩৫তম: ব্রেটন উডস' (*Bretton Woods*) প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। [**]

প্রিলি বেসিক ভিউ এর ৩৬ পৃষ্ঠা থেকে আনতে হবে।

৩৬তম: কপিরাইট (Copyright) কী? [**]

কপিরাইট বলতে কোন কাজের উদ্ভাবক সেই কাজটির উপর একক ও অনন্য অধিকারকে বোঝানো হয়। কপিরাইট সাধারণত একটি সীমিত মেয়াদের জন্য কার্যকর হয়। ঐ মেয়াদের পর কাজটি পাবলিক ডোমেইনের অন্তর্গত হয়ে যায়। কপিরাইটের চিহ্ন হল ©। কপিরাইট বা মেধাসত্ত্ব একটি আইনি অধিকার। সাধারণত কোনো দেশের সরকার এই ধারণাটির বাস্তবায়ন করে। বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টিধর্মী কাজ তথা গবেষণাকর্ম, সাহিত্যকর্ম, নাট্যকর্ম, শিল্পকর্ম, সঙ্গীতকর্ম, চলচ্চিত্রকর্ম, ফটোগ্রাফি, ভাস্কর্যকর্ম, সম্প্রচারকর্ম, সফটওয়্যার, ওয়েবসাইট

ইত্যাদি অন্যকে পুনরায় প্রকাশ করতে না দেওয়ার অধিকার একান্তভাবে এর মূল স্রষ্টার।

এ ধরনের অধিকারকেই বলে কপিরাইট। অর্থাৎ কপিরাইট বলতে কোনো কাজের মূল কর্তার সেই কাজটির উপর একক ও অনন্য অধিকারকে বোঝানো হয়।

সম্পদ ২ ধরনের– বস্তুগত সম্পদ ও মেধা সম্পদ। মানুষের বস্তুগত সম্পদ যেমন মালিক ছাড়া অন্য কেউ অনুমতি বা মূল্য পরিশোধ ব্যতীত ভোগ বা ব্যবহার করতে পারে না, মেধা সম্পদের ক্ষেত্রেও সে বিধান একইভাবে প্রযোজ্য। প্রতিটি মেধাকর্ম কপিরাইট আইনে গ্রন্থস্বত্ব বা লেখস্বত্ব দ্বারা রক্ষিত।

১৯৭০ সালে ইংল্যান্ডে কপিরাইট আইন প্রথম প্রণীত হয়। তবে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মেধাস্বত্ব রক্ষার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (*WTO*) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য একটি আইন/চুক্তি প্রণয়ন করেছে- *The Agreement on Trade-Related Aspects of Inteleetual Property Rights, TRIPS*. এই এগ্রিমেন্টে *WTO* এর প্রত্যেক সদস্য দেশের উপর অন্যদেশের মেধাস্বত্ব অধিকার মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও মেধাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণের জন্য *World Intellectual Property Organization, WIPO* নামে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। এক কথায় বললে উদ্ভাবন fee ই হলো কপিরাইট, যা শুধু উদ্ভাবকই পেয়ে থাকে।

৩৬তম: WTO এর কার্যাবলি সংক্ষেপে লিখুন।

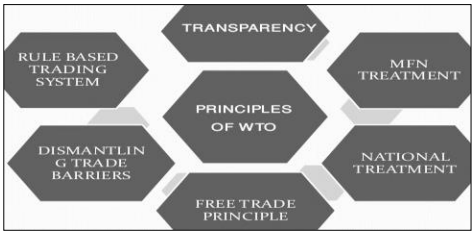

১৯৮৬ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চলতে থাকা উরুগুয়ে রাউন্ডের মাধ্যমে GATT থেকে চালু হয় WTO. এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য ভারসাম্য নিশ্চিত করা। জেনেভাভিত্তিক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) তে সদস্য রয়েছে ১৬৪টি। এ পর্যন্ত ১১টি মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে এ সংস্থাটির সর্বশেষ বাণিজ্য কর্মসূচি চলমান রয়েছে, যা দোহা রাউন্ড নামে পরিচিত।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাজ:

১. বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ফোরাম হিসেবে কাজ করা।
২. Multilateral Negotiation Final Act অনুযায়ী বাণিজ্য সমস্যা সমাধান করা।
৩. বহুপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনার জন্য ফোরাম হিসেবে কাজ করা।
৪. পক্ষপাতহীন বাণিজ্য নিশ্চিত করা।
৫. বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করা।
৬. বিভিন্ন সদস্যদেশের জাতীয় বাণিজ্য নীতিমালা পরীক্ষা করে দেখা।
৭. কারিগরি সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাণিজ্য নীতিমালার বিষয়ে সহায়তা করা।
৮. TRIPs, Copyright, TRIMs, GSP নিয়ন্ত্রণ করা।
৯. সদস্য দেশসমূহের সাথে পর্যালোচনা-পূর্ব ট্যারিফের হার নির্ধারণ করা।
১০. আমদানিকৃত পণ্যে কর ও বিধি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা।

৩৬তম: অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আসিয়ান (ASEAN) কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রক্রিয়ার নাম আসিয়ান। মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের পর মালয়েশিয়ার উদ্যোগে ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ASEAN নামের আঞ্চলিক জোটটি। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ৫টি। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১১টি। বর্তমানে সংস্থাটি আঞ্চলিক রাজনীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অর্থনৈতিক পদক্ষেপসমূহ:

১. ১৯৭৬ সালের সম্মেলনের পর ASEAN Industrial Project প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত শিল্প প্রকল্পের অধীন সদস্য রাষ্ট্রগুলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে মনোযোগী হতে Preferential Trading Agreement স্বাক্ষর করে।
২. ১৯৯০ এর দশকে চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে আসিয়ানের অর্থমন্ত্রী পর্যায়ের ASEAN+3 চুক্তি হয়।
৩. আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সাথে APEC, RCEP, CPTPP ও IPEF এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাখে।
৪. ১৯৯৪ সালে ASEAN Regional Forum প্রতিষ্ঠা হয়।
৫. বর্তমান অর্থনীতিতে আসিয়ানকে *Rising Dragon* হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
৬. ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ASEAN Economic Community.

৭. ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর চতুর্থ বৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশের এ আঞ্চলিক জোট।
৮. ২০২০ সালে আসিয়ানভুক্ত ১০টি দেশ, আসিয়ান+৩ এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড মিলে ১৫টি দেশ RCEP নামে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে।

৩৪তম: ট্যারিফ (Tariff) ও ট্যাক্স (Tax) এর মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা করুন। [**]

ট্যারিফ:

Tariff শব্দের অর্থ হলো বাণিজ্য শুল্ক বা মূল্য তালিকা বা A list of Charge. আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর যে কর আরোপিত হয় তাকে বাণিজ্য শুল্ক বলে। শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধাকে বলা হয় জিএসপি। Tariff প্রধানত ৩ প্রকার-

১. ট্রানজিট শুল্ক:

যেসব পণ্য এক দেশে উৎপাদিত হয় এবং অন্য কোনো দেশের মধ্য দিয়ে তৃতীয় কোনো দেশে বিক্রয় বা ব্যবহারের জন্য নেয়া হয় সেসব পণ্যের ওপর প্রযোজ্য কর (tax) কে Transit Tariff বলে। যে দেশের ওপর দিয়ে পণ্য পরিবাহিত হয়, সে দেশ ট্রানজিট শুল্ক গ্রহণ করে থাকে। যেমন- বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য ভুটানে গেলে ভারত যদি ট্রানজিট দেয়, তাহলে ভারত ট্রানজিট শুল্ক গ্রহণ করবে।

২. রপ্তানি শুল্ক: পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে শুল্ক আদায় করা হয়, তাকে রপ্তানি শুল্ক বলে।

৩. আমদানি শুল্ক: পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যে শুল্ক আদায় করা হয়, তাকে আমদানি শুল্ক বলে।

Tax বা কর:

Tax অর্থ কর বা খাজনা। ট্যাক্স সরকার কর্তৃক সাধারণ জনগণের উপর ধার্য হয়। কর হলো সরকারি কর্তৃপক্ষকে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সরবরাহকৃত দ্রব্য বা সেবার বিনিময়ে প্রদেয় মূল্য। অন্যভাবে বলা যায়, কর হলো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত সরকারি কর্তৃপক্ষের একটি আবশ্যকীয় চাঁদা। ট্যাক্স বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাম ধারণ করে।

- আমদানি/ রপ্তানি পণ্যের উপর প্রয়োগ হলে শুল্ক (tariff);
- দেশে উৎপাদিত পণ্যের উপর আরোপিত হলে আবগরি শুল্ক (excisebuty);
- বিক্রয়মূল্যের অতিরিক্ত হিসেবে কোনো কর আরোপিত হলে ভ্যাট (vat) প্রভৃতি।

৩১তম: দোহা রাউন্ড সম্পর্কে লিখুন। [**]

২০০১ সালের ৯-১৩ নভেম্বর কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ৪র্থ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দোহা রাউন্ড বা Doha Development Round নামে পরিচিত।

দোহা ঘোষণায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ গুরুত্ব পায়:

১. বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণ।	৫. ডাম্পিং ও অ্যান্টি ডাম্পিং আইন সংরক্ষণ।
২. কৃষিখাতে ভর্তুকি।	৬. পরিবেশ সংরক্ষণ।
৩. বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ উৎপাদনে পেটেন্ট অধিকার সংরক্ষণ।	৭. শিক্ষাক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস।
৪. নতুন নতুন রাউণ্ড শুরু করার আহ্বান।	৮. মরণব্যাধী এইডস রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩০তম: সাফটা ও সাপটা [**]

South Asian Free Trade Area, SAFTA:

ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি দিনে (৬ জানুয়ারি, ২০০৪) সার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ঐতিহাসিক সাফটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিটি ১ জানুয়ারি ২০০৬ সালে কার্যকর হয়। সাফটা চুক্তিতে মূলত ছয়টি বিষয় আছে–

১. বাণিজ্য উদারীকরণ কর্মসূচি;
২. রুলস অফ অরিজিন;
৩. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা;
৪. সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা;
৫. স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বিশেষ ও পার্থক্য নির্দেশকারী? (Special and Pref-ferential treatment);
৬. বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদ মিমাংসার পদ্ধতি।

SAPTA, SAARC Preferential Trading Arrangement:

১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৭ম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে স্বাক্ষরিত অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তিই সাপটা। ১৯৯৫ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়। সাপটার চারটি রাউন্ডের আলোচনায় নির্ধারিত হওয়া বিষয়বস্তুসমূহ–

- ৫,৫০০ পণ্যের উপরে শুল্ক সুবিধা ৫%-১০০% প্রদান করা।
- রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উপর থেকে ট্যারিফ, প্যারা-ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা দূর করা।
- সাপটার আর্টিকেল ১০-এ স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোর অনুকূলে Special and Deferential Treatment প্রদানের ব্যবস্থা রাখা ঐচ্ছিক প্রকৃতির (Best Endeavour Clauses) ও বাধ্যতামূলক অঙ্গীকার (binding commitment) ছিল না।

২৮তম: NAFTA-এর এর বর্তমান রূপ বা USMCA কী? [**]

North American Free Trade Agreement (NAFTA)-এর সদস্য ৩টি দেশ-

১. কানাডা ২. মেক্সিকো ৩. যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি অনুমোদন করে। NAFTA চুক্তি কার্যকর হয় ১ জানুয়ারি ১৯৯৪ সালে। ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি ছিল নাফটা চুক্তি ত্যাগ করার। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০১৮ সালের ৩০ নভেম্বর আর্জেন্টিনার বুয়েন্সআয়ার্সে অনুষ্ঠিত জি-২০ এর সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা USMCA নামে নতুন বাণিজ্য চুক্তি করে। Unitesd States, Mexico & Canada, USMCA কে New NAFTA নামেও ডাকা হয়। USMCA তে গুরুত্ব পাবে–

ক. পশু বাণিজ্য গ. গাড়ি বাণিজ্য
খ. পরিবেশ আইন ঘ. শ্রম আইন

২৮তম: WIPO কী? [**]

WIPO এর পূর্ণরূপ হল World Intellectual Property Organization. জাতিসংঘের ১৭টি বিশেষায়িত সংস্থার একটি হলো WIPO. সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে পরিচালিত এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালের ১৪ জুলাই। এটি জাতিসংঘের মেধা সংরক্ষণ সংস্থা।

এর কার্যক্রমসমূহ:

১. বিশ্বব্যাপী সৃজনশীল বা বুদ্ধিসম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রক্ষা করা ও শ্রদ্ধাবোধ বাড়ানো।
২. সৃজনশীল কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন।
৩. শিল্প ও সাহিত্যকর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটানো।
৪. পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক বা Geographical Indication (GI) স্বীকৃতি প্রদান করে।
৫. মেধাস্বত্ব বা TRIPs মর্যাদা প্রদান করে।

২৮তম: SAGQ-কী?

SAGQ এর পূর্ণরূপ South Asian Growth Quadrangle বা দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন চতুর্ভুজ। SAGQ ঘোষিত হয় ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপালের BBIN পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক। ১৯৯৭ সালে সার্কের নবম শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বে SAGQ এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) SAGQ এর আঞ্চলিক সহযোগিতায় ইতোমধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং SAGQ এর লক্ষ্যপূরণের লক্ষ্যে তারা South Asia Sub regional Economic Co-operation (SASEC) নামক একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে SASEC ভুক্ত দেশ ৭টি। মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ পরে সদস্যপদ লাভ করে।

২৩তম: Purchasing Power Parity [***]

Purchasing Power Parity (PPP) বা ক্রয় ক্ষমতার সমতা(পিপিপি) আন্তঃদেশীয় মুদ্রার প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপের একটি জনপ্রিয় সূচক। এটি একটি তত্ত্বীয় পদ্ধতি, যার মাধ্যমে দুইটি ভিন্ন মুদ্রার দীর্ঘমেয়াদে বিনিময় হারের সাহায্যে তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রের ১টি কম্পিউটারের দাম ১০০০ মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশে সেই একই কম্পিউটারটির দাম ১,০০০০০ টাকা, তাহলে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা হার হবে ১ মার্কিন ডলার (১,০০,০০০/১,০০০) = ১০০ টাকা। পিপিপির বিনিময় হারের জন্য ১০০ টাকার মান হবে ১ মার্কিন ডলার।

যদি কোনো পণ্যের আঞ্চলিক বিনিময় হার তুল্য মুদ্রার মানের থেকে বেশি হয়, তবে কম বিনিময় হার বিশিষ্ট মুদ্রাটি বড় বিনিময় হার বিশিষ্ট মুদ্রার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। যদি একটি পণ্যের মূল্য এক ডলার হয়, এবং ঐ একই পরিমাণ ও মানের পণ্যের মূল্য যদি টাকায় ১০০ টাকা হয়, তবে ক্রয়ক্ষমতা সমতার বিনিময় হার হবে ১০০ টাকা সমান ১ ডলার।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে, সুইডেনের অর্থনীতিবিদ গুস্তাফ কাসেল ক্রয়ক্ষমতা সমতা তত্ত্বটি প্রদান করেন। অর্থখাতের জন্য আলোচ্য বিষয় হিসেবে দেশের মানুষের Purchasing Power Parity বা ক্রয় ক্ষমতার সমতার বাস্তবতা বেশ গুরুত্ব বহন করে। দেশভেদে, মুদ্রার মানভেদে, পণের অভ্যন্তরীণ মূল্যভেদে মানুষের হাতে অর্থের সংস্থানের পরিমাণগত পার্থক্য অনুযায়ী পিপিপির বিষয়টি বিবেচিত হয়।

- ❖ একটি দেশের নাগরিকরা প্রকৃতপক্ষে কতটা ধনী তা বোঝার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে তাদের কতটা ক্রয় ক্ষমতা রয়েছে তা নির্ধারণ করা। অর্থাৎ সে যে টাকা আয় করে তা দিয়ে সে যা খুশি কিনতে পারে। এ কারণেই বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির তুলনা করার জন্য ক্রয় ক্ষমতা সমতার (পিপিপি) ভিত্তিতে জিডিপি'র আকার গণনা করা হয়।
- ❖ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে (পিপিপি) দেশের অর্থনীতির আকার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হাজার বিলিয়ন ডলার বা ১ ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলকে পৌছেছে। সংস্থাটির বিশ্লেষণ বলছে, ২০২১ সালে পিপিপির ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ছিল ৯৬৬ দশমিক ৪৮৫ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২২ সালে ১ হাজার ৬১ দশমিক ৫৭১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

২২তম: জিএসপি (GSP) [***]

GSP এর পূর্ণরূপ Generalized System of Preferences জিএসপি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে একটি সুবিধার নাম। এটি একটি অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা। পণ্যের শুল্কমুক্ত বাণিজ্যই (tariffless trade) জিএসপি সুবিধা। বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ECOSOC ১৯৭১ সালে বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে নিয়ে গঠন করে স্বল্পোন্নত দেশ বা LDCs. ১৯৭১ সাল থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা স্বল্পোন্নত দেশের জন্য চালু করে GSP সুবিধা। জিএসপির সর্বোচ্চ হার ১৭-১৮ শতাংশ। জিএসপি ধারণাটি ১৯৭১ সালের। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে এলডিসিভুক্ত হয় এবং ১৯৭৬ সাল থেকে জিএসপি সুবিধা পায়। বাংলাদেশ ২০১৮ সালে এলডিসিমুক্ত হওয়ার ঘোষণা হওয়ায় ২০২৬ সালে এলডিসি মুক্তির চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাবে। ২০২৭ সাল থেকে বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধা হারাবে। উল্লেখ্য, জিএসপি পদ্ধতিতে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে ১২.৫% শুল্ক রেয়াত পায়।

১৮তম: ছিটমহল ও করিডোর কাকে বলে? [**]

ছিটমহল (Enclave):

ছিটমহল হলো একটি রাষ্ট্রের মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অংশ যা অন্য রাষ্ট্রের ভূমি বা জলভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে। যেমন- দহগ্রাম আঙ্গরপোতা। ভারতের ভিতরে বাংলাদেশের মোট ছিটমহল ছিলো ৫১টি এবং বাংলাদেশের ভিতর ভারতের ছিটমহল ছিলো ১১১টি। ছিটমহল অন্য রাষ্ট্রের সীমানা দিয়ে ঘেরা থাকে।

করিডোর:

করিডোর শব্দটির আভিধানিক অর্থ বারান্দা বা দরদালান বা "a passage way to apartments independent of each other". বিচ্ছিন্ন ছিটমহলে গমনের জন্য ২ দেশের সম্মতিতে অন্য দেশ কর্তৃক যে সংকীর্ণ রাস্তা বা পথকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়, তাকে করিডোর বলে। যেমন- "তিন বিঘা করিডোর"।

অর্থাৎ, নিজ দেশ থেকে নিজ দেশে যাওয়ার জন্য অন্য দেশের জমি ব্যবহার করলে তাকে বলে করিডোর বলে। চুক্তির মাধ্যমে এক দেশ আরেক দেশকে করিডোর প্রদান করে।

সিলেবাস অনুযায়ী এই অধ্যায়ের বিষয়সমূহ

➢ অর্থনৈতিক মন্দা (Economic recession)/ depression & the great depression

অর্থনৈতিক মন্দা হচ্ছে অর্থনীতির সেই অবস্থা, যখন চাহিদার ঋণাত্মক প্রভাবে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। সর্বজনীনভাবে যখন একটি দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) টানা ৬ মাস হ্রাস পায়, তখন এই সময়কালকে অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক মন্দা (recession) বলা হয়। জিডিপি প্রবৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত নেতিবাচক হওয়ার আগে বেশ কয়েকটি ত্রৈমাসিকের জন্য মন্থর হবে। মন্দায় পরপর দুই বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে জিডিপি সঙ্কুচিত হতে পারে।

মন্দা দেখা দিলে ৫টি অর্থনৈতিক সূচকে প্রভাব পড়ে। যেমন-

১. প্রকৃত মোট দেশজ উৎপাদন
২. ম্যানুফ্যাকচারিং
৩. খুচরা বিক্রয়
৪. আয় ও মজুরি
৫. কর্মসংস্থান।

এ সূচকগুলোর পতন হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয় জিডিপিতে রূপান্তরিত হয়। তবে ২য় ত্রৈমাসিকে যদি কোনো দেশের জিডিপি ১০ শতাংশের বেশি কমে যায়, তাহলে তাকে Depression বলে। যেমন- ২০০৮ এবং ২০০৯ সালে পরপর ৪টি ত্রৈমাসিক নেতিবাচক জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল।

অন্য দিকে, মহামন্দা (great depression) হলো অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে কয়েক বছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি সঙ্কোচন। অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের জন্য ডিপ্রেশন থাকে ও আয়, উৎপাদন, খুচরা বিক্রয় বছরের পর বছর ধরে প্রভাবিত হয়। যেমন- ১৯২৯ সালের গ্রেট ডিপ্রেশন টানা ৬ বছরের জন্য জিডিপি নেতিবাচক হওয়ার কারণ হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৩০-এর দশকে মহামন্দা এসেছিল, যাকে বলা হয় the great depression.

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মতে,

"বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশ যখন ৩ শতাংশের কম হয়, তখন সেই পরিস্থিতিকে বৈশ্বিক মন্দা বলা যায়।"

অর্থনীতিবিদগণ বলেছেন, মন্দার প্রভাবে–

১. ঋণ সংকোচন হয়
২. উৎপাদন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়
৩. অর্থনীতির প্রসার বাধাগ্রস্ত হওয়ায় সৃষ্টি হয় কর্মহীনতা

➢ দ্য গ্রেট ইনফ্লেশন (the great inflation):

১৯৭০ ও ১৯৮০ দশকের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে স্ট্যাগফ্লেশন দেখা দিয়েছিল। জ্বালানি তেলের দাম ও বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং সহজ মুদ্রানীতি ১৯৮০ সালে ভোক্তা মূল্য সূচককে ১৪.৮ শতাংশে ঠেলে দিয়েছিল। ১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি ছিল ১%। কিন্তু ১৯৮০ সালে তা বেড়ে ১৪ শতাংশেরও বেশি হয়ে যায়। তাছাড়া, ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে জ্বালানি তেলের দামের ৪ গুণ বৃদ্ধি সেই সময়ের অর্থনৈতিক স্ট্যাগফ্লেশন সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। এ সময়কেই বলা হয় দ্য গ্রেট ইনফ্লেশন।

➢ Balance sheet recession:

ব্যালেন্স শিট মন্দা হল এক ধরনের অর্থনৈতিক মন্দা যা তখন ঘটে, যখন বেসরকারি খাতের উচ্চ ঋণ ব্যক্তি বা সংস্থাগুলোকে ব্যয় বা বিনিয়োগের পরিবর্তে ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করে, যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পায়।

এ অবস্থায় বেসরকারি খাতের একটি বড় অংশ প্রকৃতপক্ষে মুনাফা সর্বাধিক করার পরিবর্তে ঋণ কমানোর দিকে মনোযোগ দেয়। এর ফলে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায় এবং অর্থনীতিকে একটি বিশেষ ধরনের মন্দার মধ্যে ফেলে দেয়।একেই ব্যালেন্স শিট মন্দা বলা হয়।

অর্থনীতিবিদ রিচার্ড কু প্রথম এ ধারণার প্রবর্তন করেন। তিনিসহ কিছু অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেন যে ব্যালেন্স শিট মন্দা থেকে পুনরুদ্ধার করা বিশেষভাবে কঠিন। এ অবস্থায় মুদ্রানীতি মূলত অকার্যকর হয়ে পড়ে, কারণ যাদের অনিশ্চিত ব্যালেন্স শিট রয়েছে তারা টাকা ধার করতে অস্বীকার করে, সুদের হার যতই কম হোক না কেন।

➢ Hard Currency & Soft Currency:

Hard Currency:

হার্ড কারেন্সি বলতে এমন মুদ্রাকে বোঝায় যার মান স্থিতিশীল, অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় শক্তিশালী, বিনিয়োগকারীরা যে মুদ্রায় বিনিয়োগ করতে আস্থাশীল এবং বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল দেশগুলোর মুদ্রা হার্ড কারেন্সি হয়। উদাহরণ- মার্কিন ডলার, ইউরো।

Soft Currency:

সফট কারেন্সি বলতে এমন মুদ্রাকে বোঝায় যার মান ক্রমাগত ওঠানামা করে, প্রধানত অন্যান্য মুদ্রার তুলনায় এর মান কম, কারণ ফরেক্স মার্কেটে সেই মুদ্রার চাহিদা কম। চাহিদার এই অভাবটি বিভিন্ন কারণের দ্বারা চালিত হতে পারে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি দেশের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ফলাফল। উদাহরণ- জিম্বাবুয়ের ডলার এবং ভেনিজুয়েলার বলিভার।

➢ সভরেন বন্ড/সার্বভৌম বন্ড (Sovereign Bond): [**]

সার্বভৌম বন্ড হলো জাতীয় সরকার কর্তৃক জারি করা একটি ঋণ সুরক্ষা। সরকার বিভিন্ন প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের জন্য ইস্যু করে থাকে। যেমন–

⇨ সরকারি কর্মসূচির অর্থায়ন
⇨ পুরোনো ঋণ পরিশোধ
⇨ বর্তমান ঋণের সুদ পরিশোধ এবং

⇨ অন্য কোনো সরকারি ব্যয়ের প্রয়োজনে। সার্বভৌম বন্ড কর রাজস্বের পাশাপাশি সরকারি অর্থায়নের একটি উৎস। সাধারণত ব্যয় মেটাতে, সরকারের কাছে ২টি বিকল্প থাকে–

১. কর বাড়ানো
২. বন্ড ইস্যু করা।

কর বাড়ানো একটি অজনপ্রিয় পদক্ষেপ এবং এর একটি দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে। সুতরাং,এক্ষেত্রে সরকারের কাছে পছন্দনীয় হচ্ছে সার্বভৌম বন্ড। সার্বভৌম বন্ড একটি বিশেষ ধরনের বন্ড যা সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক পুঁজি বাজারে বিক্রি করার অধিকার রাখে এবং এর মধ্যে দিয়ে সেই রাষ্ট্র অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা Balance of Payment ঘাটতি মোকাবেলা করতে কাজে লাগায়। সরকারের আয়ের চাইতে ব্যয় বেশি হয়ে গেলে অনেক দেশ সার্বভৌম বন্ড চালু করে। সাধারণত এর মাধ্যমে অতিরিক্ত ব্যয়ের অর্থ যোগায় । একটি সার্বভৌম বন্ড বিদেশি এবং অভ্যন্তরীণ উভয় মুদ্রায় জারি করা হতে পারে। অন্যান্য বন্ডের মতো, এগুলোও ক্রেতাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বছরের জন্য সুদের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিশোধ করার এবং পরিপক্কতার সময় অভিহিত মূল্য পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। অন্যান্য ধরনের বন্ডের মতোই, একটি সার্বভৌম বন্ড ক্রেতাকে পর্যায়ক্রমিক সুদ প্রদান করে এবং মেয়াদপূর্তির তারিখে অভিহিত মূল্য পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। চার্জ করা সুদের হার ০৩টি প্রাথমিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে–

১. একটি দেশের ঋণযোগ্যতা,
২. অর্থনীতিকে ব্যাহত করতে পারে এমন সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং
৩. বিনিময় হার।

❖ **সার্বভৌম বন্ডের ঝুঁকি:**

ক. মুদ্রা ঝুঁকি (Currency Risk): বিনিময় হারের ওঠানামা মুদ্রা ঝুঁকির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। যে সার্বভৌম বন্ড অস্থিরতার ইতিহাস সহ বৈদেশিক মুদ্রায় জারি করা হয়, তা বিনিয়োগকারীদের জন্য ভালো চুক্তি নাও হতে পারে যদিও তা উচ্চ সুদের হার প্রদান করে।

খ. ক্রেডিট ঝুঁকি (Credit Risk): ক্রেডিট ঝুঁকি বলতে বোঝায় যখন সরকার তার মুদ্রায় নির্ধারিত সার্বভৌম বন্ড ডিফল্ট করতে বাধ্য হয়। স্থানীয় মুদ্রায় জারি করা একটি সরকারি বন্ডকে ঝুঁকিমুক্ত বন্ড হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ সরকার যদি সিদ্ধান্ত নেয়, তবে অতিরিক্ত মুদ্রা ছাপিয়ে পরিস্থিতি সামলানোর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

গ. সুদের হারের ঝুঁকি (Interest Rate Risk): অন্যান্য ঋণ উপকরণের মতো, সার্বভৌম বন্ডগুলি সুদের ঝুঁকির সাথে সম্পৃক্ত। সুদের হার এবং বন্ডের দামের দিক বিপরীতভাবে সমানুপাতিক। সুদের হার হ্রাস বন্ডের মূল্য বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে এবং বিপরীতক্রমেও ।

ঘ. মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি (Inflation Risk): সাধারণত, বিনিয়োগকারীরা একটি নির্দিষ্ট স্তরের মুদ্রাস্ফীতির ধারণা করে, কিন্তু যখন এ হার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হয়, তখন মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি দেখা দেয়।

শ্রীলংকা ও সার্বভৌম বন্ড:

চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটকাল অতিক্রম করছে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকা। দেশটি একদিকে বৈদেশিক ঋণের ভারে জর্জরিত, অন্যদিকে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে তৈরি হয়েছে অচলাবস্থা। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কখনো এতোটা দুরাবস্থায় পড়েনি দেশটি। বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র সংকট বেসামাল করে তুলেছে দ্বীপরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে। শ্রীলংকার এ সমস্যা রাতারাতি তৈরি হয়নি। গত ১৫ বছর ধরে এ সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন উৎস থেকে ব্যাপকভাবে ঋণ নিয়েছে শ্রীলংকার বিভিন্ন সরকার। এসব ঋণের অন্যতম উৎস হচ্ছে সার্বভৌম বন্ড। ২০০৭ সাল থেকে দেশটির সরকার অর্থ জোগাড়ের জন্য সার্বভৌম বন্ড ইস্যু করেছে। আন্তর্জাতিক সার্বভৌম বন্ড বাবদ শ্রীলংকার ঋণ রয়েছে এখন ১২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সব মিলিয়ে চলতি বছর শ্রীলংকাকে প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এ ঋণের মধ্যে বৈদেশিক ঋণ (আন্তর্জাতিক সার্বভৌম বন্ড) ১.৫ বিলিয়ন ডলার। ধারণা করা হচ্ছে,চলতি বছর এসব ঋণ শোধ করতে পারবে না দেশটি।

➢ পেট্রো ডলার (Petrodollar):

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস হচ্ছে পেট্রো ডলার ব্যাবস্থা। পেট্রো ডলার শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পেট্রোলিয়াম ডলার এর সংক্ষিপ্ত রুপ। ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন সৌদি আরবকে তাদের সব পেট্রোলিয়াম পণ্য, অর্থাৎ

শোধিত তেল, খনিজ তেল ও গ্যাস একমাত্র মার্কিন ডলারে বিক্রি করার প্রস্তাব দেন, যার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী সৌদি আরবকে পূর্ণ সামরিক নিরাপত্তা প্রদান করবে এবং শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা করবে। সেসময়ে প্রথমে সৌদি আরব এবং পরে অন্যান্য তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় দেশ চুক্তিটি স্বাক্ষর করে এবং এর মধ্যে দিয়ে পেট্রো ডলারের যাত্রা শুরু হয়। ওপেকভুক্ত সবগুলো রাষ্ট্রই ডলারে তেল বিক্রি করতে শুরু করে। যেহেতু তেলই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এনার্জি রিসোর্স। তাই তেল উৎপাদনকারী সবগুলো রাষ্ট্র যখন ডলারে কেনাবেচা শুরু করে, তখন ডলারই হয়ে ওঠে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং একক রিজার্ভ কারেন্সি। বিশ্বের প্রায় সবগুলো রাষ্ট্র ডলারে কেনাবেচা শুরু করে, ডলারে বন্ড কেনে, এবং ফরেন রিজার্ভ হিসেবে ডলার সঞ্চয় করে রাখতে শুরু করে। অর্থাৎ সবাই ডলারের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং ডলারের স্থিতিশীলতার উপর বিশ্বাস করতে শুরু করে।

যুক্তরাষ্ট্রের পেট্রোডলার রাজনীতি:

পেট্রোডলারের রাজনীতিকে এক লাইনে ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হবে- 'ডলারের ওপরে বাধ্যতামূলক নির্ভরশীলতা তৈরি করা।' অর্থাৎ কোনো দেশ ডলার ছাড়া তেল কিনতে পারবে না, আর ডলার পেতে হলে দ্বারস্থ হতে হবে মার্কিনীদের কাছে। এই চেইন মেনে চলার মাধ্যমে বিশ্বের প্রতিটি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের হাতের মুঠোয় থাকে। চাইলেই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে যেকোনো দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়া যায়- যার উৎকৃষ্ট উদহারণ ইরান।

তেলের দাম ডলারে নির্ধারণ করার অন্যতম প্রধান একটি সমস্যা হচ্ছে, তেলের মূল্য যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যখন দেশীয় মুদ্রার বিপরীতে ডলার শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন তেল আমদানিকারক দেশগুলোকে বেশি মূল্য পরিশোধ করতে হয়। অপরদিকে রপ্তানিকারক দেশগুলো লাভবান হয়। আর যখন ডলারের মূল্যমান কমে যায়, তখন আমদানিকারক দেশগুলো লাভবান হয় এবং রপ্তানিকারক দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে তেল ও গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলো অর্থনৈতিক ঝুঁকি এড়াতে সব সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের মুদ্রানীতির সামঞ্জস্য রেখে চলে। শুধু মুদ্রানীতি নয়, তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

➢ SWIFT ও রাশিয়ার সুইফট লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা [**]

SWIFT-এর পূর্ণরূপ হলো Society for Worldwide International Financial Telecommunication. এটি মূলত দ্রুত আর্থিক লেনদেনের বার্তা আদান-প্রদানের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাঠানো বার্তা অত্যন্ত সুরক্ষিত থাকে। পাশাপাশি এটি বিশ্বের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে ব্যাংকগুলো অনেক বড় অংকের অর্থ অতি দ্রুত লেনদেন করতে পারে। সুইফট হলো দ্রুত ও নিরাপদে আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রধান ব্যবস্থা। বর্তমানে বিশ্বের ২০০টিরও বেশি দেশের ১১ হাজার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ নেটওয়ার্কে যুক্ত। সুইফটকে বলা হয় আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড।

➲ SWIFT কিভাবে কাজ করে:

সুইফট নেটওয়ার্ক হলো শুধুই একটি যোগাযোগের মাধ্যম, এর মাধ্যমে সরাসরি অর্থ প্রেরণ করা যায় না। সুইফট শুধু অনলাইনে পেমেন্ট অর্ডার প্রেরণ করে। একটি ব্যাংক তাদের সুইফট নেটওয়ার্ক এ সংযুক্ত অন্য একটি ব্যাংককে অর্থ পরিশোধের অনুরোধ পাঠায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সেই আদেশ গ্রহণ করে সে অনুযায়ী কাজ করে। যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিদেশের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠায় তখন সুইফট কোডের প্রয়োজন হয়। সুইফট কোড হলো সুইফট কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত এমন একটি কোড যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট দেশ, ব্যাংক এবং ব্যাংকের শাখা শনাক্ত করা হয়। সুইফট কোড ৮টি বর্ণ অথবা ১১টি ক্যারেক্টার নিয়ে গঠিত।

➲ **SWIFT ব্যবস্থা থেকে রাশিয়াকে বাদ দেয়া:** রাশিয়ার ইউক্রেন হামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আন্তর্জাতিক লেনদেন ব্যবস্থা সুইফট থেকে রাশিয়াকে বাদ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্যরা বলছে, এই পদক্ষেপ নিশ্চিত করবে, রাশিয়ার ব্যাংকগুলো আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে, যাতে বিশ্বব্যাপী তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার সামর্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

➲ নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য ফলাফল:

১. নিষেধাজ্ঞার ফলে রাশিয়ার জ্বালানি এবং কৃষিপণ্য বিক্রির অর্থ আদায় মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ব্যাংকগুলোকে এখন সরাসরি একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। এতে সময়ক্ষেপণ হবে এবং বাড়তি খরচ গুনতে হবে, যা শেষ পর্যন্ত রুশ সরকারের রাজস্ব আয় কমিয়ে দেবে।

২. ২০১৪ সালে রাশিয়া সুইফটের বিকল্প হিসেবে System for Transfer of Financial Messages (SPFS) নামে আর্থিক বার্তা স্থানান্তর করার একটি বিকল্প সিস্টেম স্থাপন করে। আর রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বাধামুক্ত বাণিজ্য হতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ২০১৫ সালে চীন প্রতিষ্ঠা করে Cross Border International Payment (CIPS). তাই অনেকের অভিমত সুইফটের নিষেধাজ্ঞা প্রভাবটি দীর্ঘ হবে না।

৩. বর্তমানে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ লেনদেনের ২০ শতাংশ SPFS'র মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ২০২৩ সালের মধ্যে যা ৩০ শতাংশে উন্নীত করতে চায় রুশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

৪. এর ফলে শুধু রাশিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন নয়। রাশিয়ার সাথে ব্যবসা রয়েছে, এমন পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোও এর ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।রাশিয়ার সুইফট ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অনিচ্ছুক ছিল জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইতালির মত কয়েকটি দেশ।

৫. সুইফট ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটি প্ল্যাটফর্ম। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ মোকাবেলা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব এই ব্যবস্থা দুটি যেভাবে ব্যবহার করেছে, তাতে অনেক দেশই ভবিষ্যতে ইউএস ডলারে অর্থ জমা রাখতে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে এবং সুইফটের ওপর শতভাগ নির্ভর করার ব্যাপারেও হয়তো চিন্তা-ভাবনা করবে। যুক্তরাষ্ট্রের Justice Department মনে করে, "রাশিয়ার ওপর সুইফটের এ নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিপদে ফেলবে। কেননা রাশিয়ার কাছে তো বিকল্প আছেই। কিন্তু হঠাৎ করে এ সিদ্ধান্ত নেয়ায় বিপদে পড়ে যাবে অন্য দেশগুলো।"

➢ Bailout (বেইল আউট): [***]

গত এক দশকে বিশ্ব অর্থনৈতিক খাত বা রাজনীতিতে খুব প্রচলিত শব্দ হচ্ছে 'বেইল আউট'।
অর্থনীতির ভাষায় বেইল আউট হচ্ছে, আর্থিক সংকটের সময়ে আর্থিক সহায়তা দানের মাধ্যমে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কোন দেশের অর্থনীতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা।

বেইল আউট হচ্ছে দেনার দায়ে বা মূলধন সংকটে পড়ে দেউলিয়া হওয়ার পথে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তরফে আর্থিক সহায়তা করা। তবে রাষ্ট্রকেও অনেক সময় জাতীয় ব্যয় নির্বাহে বেইল আউটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থ ও অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তা করার উদাহরণ রয়েছে। সাম্প্রতিক আর্থিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে কয়েকটি রাষ্ট্রকে বেইল আউটের মাধ্যমে সহায়তা করার উদাহরণ আমরা ইউরোপে দেখেছি।
উদাহরণস্বরূপ গ্রিসের কথা বলা যায়। ইউরোজোনের প্রথম দেশ হিসেবে গ্রিস EU ও IMF'র কাছ থেকে বেইলআউট প্যাকেজ গ্রহণ করে। তারা এথেন্সকে **১১** হাজার কোটি ইউরো দেয়।

যখন কোন কোম্পানিকে বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বা কোন দেশকে তার চরম আর্থিক সংকটকালে (প্রায় দেউলিয়া অবস্থায়) উদ্ধারের জন্য সম্পদ সহায়তা দেয়া হয়, তাকেই 'বেইলআউট' বলা হয়। এইরূপ সহায়তা দেয়া হতে পারে–

- ঋণ (Loan)
- ঋণের গ্যারান্টি (Guarantee of loan)
- নগদ সহায়তা (Cash)
- বন্ড বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শেয়ার (Bond) ক্রয় করে।

বেইল আউট কোন দেশের জন্য যে সমস্যার সৃষ্টি করে:
যেসব দেশে বেইল আউট হয় সেদেশ–

- বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় কোন স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় না।
- স্থানীয় মুদ্রার মান কমে যেতে পারে এবং মূদ্রাস্ফীতিও বাড়তে পারে।
- ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে Check and Ballance অবক্ষয় নির্দেশ করে ।

বেইল আউটের স্বপক্ষে যুক্তি:
প্রথমত, এর মাধ্যমে সংকটগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকিয়ে রাখা হয়। সাধারণত বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই বেইল আউটের দাবি ওঠে। এর ফলে ঐসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তরা তাৎক্ষণিকভাবে লাভবান হন। অনেকে বেকার হওয়া বা আর্থিক সুবিধা বঞ্চিত হওয়া থেকে রক্ষা পান।
দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার ভেঙ্গে পড়া তথা অস্থিরতা রোধ করা হয়। বলা হয় যে, এটা ভেঙ্গে পড়লে যত ক্ষতি হবে বেইল আউটের ক্ষতি তার চেয়ে কম। এইরূপ যুক্তি কার্যত সরকার ও আমলাতন্ত্রকে তাৎক্ষণিক জবাবদিহিতা থেকে রেহাই দেয়।
তৃতীয়ত, ব্যাংক বেইল আউটের ক্ষেত্রে আরেকটি যুক্তি দেয় যে, এর মাধ্যমে আমানতকারীদের স্বার্থও রক্ষা করা হচ্ছে।

বেইল আউটের ক্ষতিকর দিক:

- রাষ্ট্র যখন বেইল আউটের দায়িত্ব নেয় নিশ্চিতভাবে তা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ অন্যান্য জরুরি খাতগুলো থেকে ব্যয় সংকুচিত করতে হয়।
- করদাতারা যে সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী নয়, তাদেরই সেই সংকটের জন্য শাস্তি দেয়া হয় এর মাধ্যমে। বিশেষত, যখন সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অনিয়ম, দুর্নীতি ও অপরিপক্ক ঝুঁকির কারণে দেউলিয়া অবস্থায় পতিত হয়। বেইল আউটের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতি একরূপ পরোক্ষ বৈধতা পায়। এর ফলে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টদের আচরণে অতীত ভুলের পক্ষে বৈধতা তৈরি হয়। তাদের ভবিষ্যত আচরণেও এর ছাপ পড়ে।

- কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি স্রেফ ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তের কারণেও সংকটে পড়ে, তাহলেও বেইলআউট ঐরূপ ঝুঁকি গ্রহণে ভবিষ্যতে অন্যদের অনুপ্রাণিত করে। অর্থাৎ এভাবে bailout হতে থাকলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এর সঙ্গে যুক্তরা ভাবতে থাকে, একইরূপ আচরণ/সিদ্ধান্ত/দুর্নীতি/ঝুঁকি নিলে সমস্যা হবে না, কারণ এর দায়ভার বইবে অন্য কেউ।
- একবার bailout হলে পরবর্তীকালের দুর্নীতিগ্রস্তদের জন্য তা একটা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি হয়।
- বেইল আউটের জন্য করদাতাদের অর্থ না দেয়ার আরেকটা যুক্তি হলো, যেসব প্রতিষ্ঠান অনিয়ম করছে তারা জেনে-বুঝে অনিয়ম করলেও এর দায়ভার বইতে হচ্ছে এমন কাউকে যে পুরো বিষয়টির কিছুই জানে না।
- অর্থশাস্ত্রে এখন বেইল আউটকে `Moral Hazard' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটা ভবিষ্যতে আরও বড় সংকটকে নিকটবর্তী করে তোলে। অর্থাৎ, বেইল আউট আসলে বড় ভবিষ্যত সংকটের বীজ রোপন করে মাত্র।
- এটা অর্থনীতির অন্য খাতে অর্থপ্রবাহকে সীমিত করে ফেলে। বিশেষ করে এটা উৎপাদনশীল খাত ও উদ্যোক্তাদের দিক থেকে অর্থ চালিত করে অকর্মণ্য ও দুর্নীতিগ্রস্তদের দিকে, লোকসানি খাতের দিকে। এর ফলে কর্মসংস্থান সংকুচিত হতে বাধ্য।
- এছাড়া অর্থনীতির এই সূত্রও স্মরণযোগ্য যে, `bad bailouts actually make financial crises worse'.

➢ Bankrupt (দেউলিয়া): [***]

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন পাওনাদার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়, তখন উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়। সাধারণত আইনসঙ্গতভাবে আদালত একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করতে পারে।

সাধারণত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুই ধরনের সত্ত্বাকে আইনগতভাবে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়ে থাকে। এই দুই ধরনের সত্ত্বার দেউলিয়াত্বের জন্য বিভিন্ন দেশে আলাদা আলাদা আইনের ব্যবস্থা রয়েছে।

কোনো দেশের সরকার যখন আর্থিক সংকটের কারণে ঋণের কিস্তি পরিশোধে অপারগ হয়, তখন দেশটি পরিচিতি পায় 'দেউলিয়া দেশ' হিসেবে। অনেক সময় আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে ঋণগ্রস্ত দেশটির সরকার, আবার অনেক ক্ষেত্রে সেই ঘোষণা দেওয়া হয় না।
করোনা মহামারির ধাক্কায় বিপর্যস্ত বিশ্ব বাণিজ্য। অর্থনৈতিক মন্দা সামলাতে না পেরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট কোম্পানিগুলো। এমনকি অনেক বড় প্রতিষ্ঠানও নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করছে।
বিশ্বজুড়ে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শুরু হয়েছে ফরাসি বিপ্লবের পর, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয়েছে গত ২ শতকেরও বেশি সময়। এই সময়সীমার বিভিন্ন পর্যায়ে ইউরোপ মহাদেশের অর্ধেক দেশ, আফ্রিকা মহাদেশের ৪০ শতাংশ দেশ এবং এশিয়ার ৩০ শতাংশ দেশ বিভিন্ন সময়ে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে।
স্বাধীন ও সার্বভৌম বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে গত ২০০ বছরে সবচেয়ে বেশিবার দেউলিয়া হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ইকুয়েডর। এ পর্যন্ত ১০ বার নিজেদের দেউলিয়া বলে ঘোষণা করেছে দেশটি।
এই তালিকায় ইকুয়েডরের পরেই আছে ব্রাজিল, মেক্সিকো, উরুগুয়ে, চিলি, কোস্টারিকা, স্পেন ও রাশিয়া। গত ২ শ' বছরে এসব দেশ নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে ৯ বার।
এছাড়া ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে গত ২০০ বছরে জার্মানি ৮ বার, যুক্তরাষ্ট্র ৫ বার, চীন ও যুক্তরাজ্য ৪ বার ও জাপান দু'বার নিজেদের দেউলিয়া বলে ঘোষণা করেছে।

লেবানন:
মধ্যপ্রাচ্যের একসময়ের সমৃদ্ধ দেশ লেবাননকে গত ৬ এপ্রিল দেউলিয়া ঘোষণা করেছেন দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রী সাদেহ আল-শামি। শামি বলেন,

> 'বাংকে দু লিবান (লেবাননের কেন্দ্রীয় ব্যাংক) এর সঙ্গে এই রাষ্ট্রটিও দেউলিয়া হয়ে গেছে। আর ক্ষতি যেহেতু হয়েই গেছে, আমরা চেষ্টা করব জনগণের ওপর থেকে এই ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনতে।'

তিনি জানান, যে ক্ষতি হয়েছে তা রাষ্ট্র ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংক এবং আমানতকারীরা ভাগাভাগি করে নেবেন।

শ্রীলঙ্কা:
নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণার তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ভারত মহাসাগরের ছোট দ্বীপদেশ শ্রীলঙ্কা। ১৯৪৮ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর সবচেয়ে কঠিন অর্থনৈতিক সংকটে পড়া এই দেশটি চলতি বছর এপ্রিলে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করে। বর্তমানে দেশটির ওপর ৫ হাজার ১০০ কোটি ডলার বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ রয়েছে।

➢ নিউ নরমাল (New Normal):

নিউ নরমাল হল সেই অবস্থা যেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সংকট পরবর্তীতে পুণঃনির্মিত হয়। এই পরিস্থিতি সংকটপূর্বকালীন পরিস্থিতি থেকে অনেকাংশেই পৃথক। কোন মহামারি, প্রাদুর্ভাব বা কোন সংকটময় পরিস্থিতি চলাকালে এবং পরবর্তী

সময়ে-পূর্বে যা ছিলো না, স্বাভাবিক ছিলো না সে ধরনের কাজ আচরণ স্বাভাবিকের মতো গণ্য হয়। অর্থ-সামাজিক দিক থেকে পূর্বের তুলনায় নতুন করে কোন কাজ বা আচরণে অভ্যস্থতা তৈরি হওয়াই হচ্ছে 'নিউ নরমাল' বা নতুন স্বাভাবিক অবস্থা।

মূলত ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দুনিয়াজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য থেকেই এই 'নিউ নরমাল' শব্দটির প্রচলন শুরু হয়। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা এবং সম্প্রতি কোভিড-১৯ এ পৃথিবীতে নিউ-নরমাল পরিস্থিতি দেখা যায়।

World Economic Forum বলেছে,
এই নিউ নরমাল গরিবদের জন্য কোন ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসবে না। বরং কোভিড-১৯ সংক্রমণের আগে যেমনটা ছিল, অবস্থা আরও ভয়াবহ হবে এবং তাদের জীবন কখনোই আর স্বাভাবিক বা নরমাল হবে না। নিউ নরমাল টার্মটি মূলত ধনীদের জন্য।"

➲ **নিউ নরমাল সময়ে অর্থনীতিবিদগণ তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে বলেছেন,**

১) বেশি সঞ্চয়, কম খরচ
২) ব্যবসায় নতুন সাপ্লাই চেইন সৃষ্টি
৩) ক্ষুদ্র ব্যবসাকে সহায়তা প্রদান

❖ **নিউ নরমাল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জগুলো হলো:**

i. রেমিটেন্স প্রবাহ ধরে রাখা
ii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব কমানো
iii. কল্যাণমূলক অর্থনীতির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ঘুরে দাঁড়াতে সহায়তা
iv. শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো।

➢ গিগ ইকোনমি (Gig Economy):

গিগ ইকোনমি হল একটি মুক্ত বাজার ব্যবস্থা যেখানকার শ্রমবাজারে সাধারণত অস্থায়ী পদের আধিক্য থাকে এবং সংস্থাগুলো স্বল্পমেয়াদী কাজের জন্য স্বাধীন কর্মী নিয়োগ করে। যেমন: ফ্রিল্যান্সার, স্বাধীন ঠিকাদার, প্রকল্প-ভিত্তিক কর্মী এবং অস্থায়ী বা খণ্ডকালীন ভাড়া করা কর্মী ইত্যাদি।'গিগ ইকোনমি' এমন একটা পরিবেশ, যেখানে অস্থায়ী চাকরির ছড়াছড়ি থাকবে আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদি চুক্তিতে স্বতন্ত্র কর্মীদের নিয়োগ দেবে। তারা ফুল টাইম কর্মীদের চেয়ে ফ্রিল্যান্সারদের গুরুত্ব বেশি দেবে এবং বেশির ভাগ কাজ এই ফ্রিল্যান্সারদের দিয়েই করাবে। গিগ অর্থনীতি কোম্পানি, কর্মী এবং ভোক্তাদের নিয়ে গঠিত। এতে গ্রাহক এবং গিগ কর্মীদের সংযুক্ত করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

➢ স্ট্যাগফ্লেশন (Stagflation):

অর্থনীতির পরিভাষায় স্ট্যাগফ্লেশন হলো একটি বিরল অর্থনৈতিক অবস্থা যা উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এবং উচ্চ বেকারত্বের সাথে স্থবির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একত্রিত করে। স্ট্যাগফ্লেশন ধারণাটি ১৯৭০ সালে সর্বপ্রথম অর্থনীতিতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত 'Stagnation' থেকে 'Stag' এবং 'Inflation' থেকে 'flation' একত্র হয়ে 'Stagflation' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'Stagnation' শব্দের অর্থ স্থবিরতা এবং 'inflation' শব্দের অর্থ মুদ্রাস্ফীতি। অর্থনৈতিক স্থবিরতা এবং মুদ্রাস্ফীতিসহ অবস্থানকেই স্ট্যাগফ্লেশন বলে। অর্থনীতিতে স্থবিরতা বিদ্যমান থাকলে নতুন বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায় এবং চলমান বিনিয়োগ ক্রমহ্রাসমান হয়। আর এ অবস্থা বিরাজ করলে উৎপাদন হ্রাস পায় ও পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়।

স্ট্যাগফ্লেশনের ফলাফল (Effects of Stagflation):

১. উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
২. ব্যবসায়ীরা মুনাফার লোভে ফটকা কারবারের আশ্রয় নেয়। ফলে প্রকৃত উৎপাদন হ্রাস পায়, কালোবাজারি প্রসারিত হয়, নগদ / অলস জমার প্রতি জনগণ উৎসাহিত হয়, সঞ্চয় স্পৃহা হ্রাস পায়, মুনাফা গঠন বাধাগ্রস্ত হয়।
৩. বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণ হ্রাস পায়, ফলে কর্মসংস্থান কমে যায়।
৪. একদিকে ভোক্তার আয় কমে যায়, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি থাকে।
৫. স্ট্যাগফ্লেশন দেখা দিলে তা দূর করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সেক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব সহ সকল নীতিই ব্যর্থ হয়।

➢ মুদ্রা যুদ্ধ (Currency War):

মুদ্রা যুদ্ধ, যা প্রতিযোগিতামূলক অবমূল্যায়ন নামেও পরিচিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে দেশগুলো তাদের মুদ্রার বিনিময় হার অন্যান্য মুদ্রার সাথে কমিয়ে এনে অন্যান্য দেশের উপর বাণিজ্য সুবিধা পেতে চায় । একটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার কমে যাওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য দেশে রপ্তানি আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠে এবং দেশে আমদানি আরও বেশি ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। উভয় প্রভাবই দেশীয় শিল্পকে উপকৃত করে, এবং এইভাবে কর্মসংস্থান, যা দেশীয় এবং বিদেশীয় উভয় বাজার থেকে

চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যখন সকল দেশ একই কৌশল গ্রহণ করে, তখন এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে একটি সাধারণ পতনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে সকল দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মুদ্রা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তুলনামূলক সুবিধা পেতে দেশগুলো মুদ্রা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যখন তারা তাদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করে, তখন তারা বিদেশী বাজারে তাদের রপ্তানি কম ব্যয়বহুল হয়। এর ফলে রপ্তানিমুখী ব্যবসা আরও সম্প্রসারিত হয় ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।
- মুদ্রা যুদ্ধ বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। শেয়ারবাজার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য কম ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। দেশের ব্যবসা তুলনামূলকভাবে সস্তা হয়ে যাওয়ায় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।
- বিশ্ব বাণিজ্যে প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগতি অর্জন এবং তাদের সার্বভৌম ঋণের বোঝা কমানোর জন্য দেশগুলো এই ধরনের কৌশল অনুসরণ করতে পারে।
- মুদ্রা অবমূল্যায়নের অপ্রত্যাশিত পরিণতি হতে পারে মুদ্রাস্ফীতি।
- দেশের ভোক্তারা আমদানিতে উচ্চ মূল্যের বোঝা বহন করে।

➢ ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট (National treatment):

ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইনের একটি ধারণা; যা ঘোষণা করে যদি কোনো রাষ্ট্র তার নিজস্ব নাগরিকদের কিছু অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে, তবে বর্তমানে দেশে থাকা বিদেশিদের সমতুল্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট (National treatment) বলতে বোঝায়, আমদানিকৃত পণ্য বাজারে প্রবেশ করার পরে আমদানিকৃত এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যগুলোকে সমানভাবে বিবেচনা করা উচিত। একই নীতি বিদেশী ও স্থানীয় পরিষেবা এবং বিদেশী ও স্থানীয় ট্রেডমার্ক, কপিরাইট এবং পেটেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই নীতিটি তিনটি প্রধান WTO চুক্তিতে রয়েছে (GATT-এর অনুচ্ছেদ- ৩ এবং TRIPS-এর অনুচ্ছেদ ৩)।

একটি পণ্য, পরিষেবা বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি বাজারে প্রবেশ করলেই ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট প্রযোজ্য হয়। তবে আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করা ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট নীতির লঙ্ঘন নয়।

উদাহরণ- যদি কোন দেশ তার উদীয়মান ওষুধ শিল্পের জন্য বিশেষ কর ছাড় প্রদান করে, তবে সেদেশে বাজারজাত করা দেশীয় বা বিদেশি নির্বিশেষে সকল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোকে কর ছাড়ের সুযোগ দিতে হবে।

➢ ওয়াশিংটন কনসেনসাস (Washington Consensus):

ওয়াশিংটন কনসেনসাস মূলত সংকটে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ওয়াশিংটনভিত্তিক ৩টি প্রতিষ্ঠানের একটি সংস্কার প্যাকেজ। আর এই ৩টি প্রতিষ্ঠান হলো- World Bank, IMF & US Tressury Department. তিনটি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময় নানা ধরনের সংস্কার কর্মসূচির কথা বলে থাকে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশকে নানা ধরনের শর্তারোপ করে। ওয়াশিংটন কনসেনসাস হলো এসব শর্তের একটি প্যাকেজ, যাতে তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই একযোগে স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ১৯৮৯ সালে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন উইলিয়ামসন (John Harold Williamson) এ ধারণাটির প্রবর্তন করেন।

Washington Consensus এর ১০টি সুপারিশ রয়েছে–

১. আর্থিক নীতির শৃঙ্খলা।
২. সরকার কোন কোন খাতে ভর্তুকি দেবে ও বিনিয়োগ বাড়াবে তা নতুন করে ঠিক করা। যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো খাতে সরকারের বিনিয়োগ ও ভর্তুকি বাড়ানো।
৩. কর খাতের সংস্কার। কর হার কমিয়ে করের আওতা সম্প্রসারণ।
৪. সুদের হার বাজারের হাতে ছেড়ে দেয়া।
৫. প্রতিযোগিতামূলক বিনিময় হার।
৬. বাণিজ্য ব্যবস্থা উদার করা-বিশেষ করে আমদানিতে। যেমন, পরিমাণগত বাধা তুলে নেওয়া।
৭. বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ আরও উদার করা।
৮. রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া।
৯. অভ্যন্তরীণ নিয়মনীতি শিথিল করা যাতে বাজারে কারো প্রবেশ বাধাগ্রস্ত না হয়।
১০. স্বত্ত্বাধিকারের (প্রোপার্টি রাইটস) ক্ষেত্রে আইনি নিরাপত্তা দেওয়া।

➢ দ্বৈত ঘাটতি (Twin Deficit):

দ্বৈত ঘাটতি (Twin Deficit) সমস্যা হলো একই সাথে রাজস্ব ও চলতি হিসাবের ঘাটতি উভয়ের বৃদ্ধি। এর মানে দেশের অর্থনীতি রপ্তানির চেয়ে বেশি আমদানি করছে এবং দেশটির সরকার আয়ের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করছে। এই 'জোড়া ঘাটতি' দেখা দেয় যখন একটি দেশের জাতীয় ব্যয় তার জাতীয় আয়ের চেয়ে বেশি এবং দেশটির বাণিজ্যিক পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন অপর্যাপ্ত হয়। যমজ ঘাটতি বা জোড়া ঘাটতি তখন ঘটে যখন একটি জাতির চলতি হিসাবের ঘাটতি এবং রাজস্ব ঘাটতি উভয়ই থাকে।

উদাহরণ: ২০১৯ সালে Asian Development Bank (ADB) -এর একটি ওয়ার্কিং পেপারে বলা হয় Sri Lanka is a classic Twin Deficit Economy. সরকারের কিছু অবিবেচক সিদ্ধান্ত দেশটিতে দ্বৈত ঘাটতি তৈরি করেছে এবং ধীরে ধীরে তা দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের কাছে ঋণে জর্জরিত শ্রীলংকা শেষ পর্যন্ত নিজেকে 'অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া' ঘোষণা করে।

▶ **রাজস্ব ঘাটতি (Fiscal Deficit):**

যখন একটি দেশের ব্যয় তার রাজস্ব আয়কে ছাড়িয়ে যায় তখন রাজস্ব ঘাটতি বা বাজেট ঘাটতি ঘটে। সহজ ভাষায়, রাজস্ব ঘাটতি এমন একটি দৃশ্য যেখানে সরকার তার রাজস্বের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করে।

সরকার প্রায়শই বন্ড ইস্যু করে রাজস্ব ঘাটতি পূরণ করে। বিনিয়োগকারীরা বন্ড ক্রয় করে কার্যত সরকারকে অর্থ ঋণ দেয় এবং ঋণের সুদ গ্রহণ করে। যখন সরকার তার ঋণ পরিশোধ করে, বিনিয়োগকারীদের মূল অর্থ ফেরত দেওয়া হয়। একটি স্থিতিশীল সরকারকে ঋণ দেওয়া একটি নিরাপদ বিনিয়োগ হিসাবে দেখা হয়।

▶ **চলতি হিসাব ঘাটতি (Current Account Deficit):**

চলতি হিসাব ঘাটতি হলো অন্য দেশে পণ্য রপ্তানি করে প্রাপ্ত অর্থ এবং অন্যান্য দেশ থেকে পণ্য ও পরিষেবা আমদানির জন্য ব্যয় করা অর্থের মধ্যে একটি ঘাটতি। এর মধ্যে রয়েছে পণ্য ও পরিষেবার রপ্তানি এবং আমদানি মূল্যের মধ্যে পার্থক্য, সেই সাথে বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিদেশ থেকে অন্যান্য অর্থ স্থানান্তর।

দেশগুলোকে ক্রমাগত ঘাটতি পূরণের জন্য অর্থ ধার করতে হবে এবং সেই ঋণের সেবার জন্য সুদ দিতে হবে।

▶ **টুইন ডেফিসিট হাইপোথিসিস (twin deficit hypothesis):**

অর্থনীতিবিদদের একটি দল বিশ্বাস করেন যে, একটি বৃহৎ বাজেট ঘাটতি একটি বড় চলতি হিসাব ঘাটতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই সামষ্টিক অর্থনৈতিক তত্ত্বটি টুইন ডেফিসিট হাইপোথিসিস নামে পরিচিত। এই তত্ত্বের পিছনে যুক্তি হল যে, সরকারী কর হ্রাস, যা রাজস্ব হ্রাস করে এবং ঘাটতি বাড়ায়, ফলে করদাতারা তাদের নতুন পাওয়া অর্থ ব্যয় করার ফলে খরচ বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত ব্যয় জাতীয় সঞ্চয়ের হার হ্রাস করে, যার ফলে দেশ বিদেশ থেকে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

যখন একটি দেশ তার রাজস্ব ব্যয়ের জন্য অর্থের ঘাটতিতে পরে, তখন এটি প্রায়শই ঋণের উৎস হিসাবে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের উপর নির্ভরশীল হয়। একই সময়ে, দেশ বিদেশ থেকে ধার করছে এবং এর নাগরিকরা আমদানিকৃত পণ্য ক্রয়ের জন্য ধার করা অর্থ ব্যবহার করছে। এর ফলে দ্বৈত ঘাটতির সৃষ্টি হয়।

➢ Forex Market:

Forex Market বা Foreign Exchange Market হচ্ছে যেখানে কারেন্সি বেচাকেনা করা হয়। ফরেক্স মার্কেট অংশগ্রহণকারীদের মুদ্রা ক্রয়, বিক্রয় বা বিনিময় করার অনুমতি দেয়। বৈদেশিক মুদ্রা (ফরেক্স) বাজার হল বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক বাজার এবং এটি ব্যাংক, বাণিজ্যিক কোম্পানি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা, হেজ ফান্ড, খুচরা ফরেক্স ব্রোকার এবং বিনিয়োগকারীদের নিয়ে গঠিত। বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ▶ অন্যান্য আর্থিক বাজার থেকে ফরেক্স মার্কেট ভিন্ন। কারণ, এই বাজারে কোন শারীরিক অবস্থান নেই।
- ▶ ফরেক্স মার্কেটের নির্দিষ্ট কোন মার্কেট লোকেশন নেই।
- ▶ ফরেক্স মার্কেট মূলত গ্লোবালি সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত; যেখানে সমস্ত লেনদেন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী ইত্যাদির মধ্যে অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে পরিচালিত হয় ।
- ▶ ইন্টারনেটে যুক্ত যেকোনো ডিভাইস যেমন কম্পিউটার, ট্যাবলেট, এমনকি স্মার্টফোন এর সাহায্যেও ফরেক্স ট্রেডিং করা যায়।

➢ 3F Crisis:

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হয় মারাত্মক সংকট। এসব সংকটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খাদ্য, জ্বালানি ও সার সংকট। এ তিনটি সংকটকে একত্রে বলা হয় 3F Crisis বা Food, Fuel & Fertilizer Crisis.

Global Donor Platform for Rural Development (GDPRD) ২০২২ সালের ২০ মে "Addressing the Impacts of the War in Ukraine on 3F (Food, Fuel, Fertilizer) Prices for Rural Small-Scale Producers" শিরোনামে International Fund for Agricultural Development (IFAD) and European Commission (EC) এর সাথে একটি ভার্চুয়াল রাউন্ড টেবিলের আয়োজন করেছে। এখানে যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট খাদ্য, জ্বালানি ও সার সংকটকে 3F Crisis বলে অভিহিত করা হয়। এরপরই বিশ্বব্যাপী আলোচনায় আসে 3F Crisis.

খাদ্য সংকট (Food Crisis):

- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা বলছে, ২০২৩ সালে বিশ্বজুড়ে অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের সংখ্যা বাড়তে পারে ১ কোটি ৩০ লাখ পর্যন্ত।
- যুদ্ধের আগে ইউক্রেন ৪৫ মিলিয়ন টন খাদ্য শস্য প্রতি মাসে রপ্তানি করতো। বিশ্বে যত গম উৎপন্ন হয় তার ৩০ শতাংশই আসে এই দুই দেশ থেকে। এছাড়া অন্যান্য শস্য এবং তেলের দামও বেড়েছে এই যুদ্ধের কারণে।
- বিশ্বব্যাপী যত গম রপ্তানি হতো তার ২৮.৯ শতাংশই করত রাশিয়া ও ইউক্রেন।
- সানফ্লাওয়ার অয়েলের ৬০ শতাংশই রপ্তানি হতো এই দুই দেশ থেকে।
- ক্রমবর্ধমান খাদ্য সংকট বিশ্বকে 'মানবিক বিপর্যয়' এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে ইতোমধ্যে সতর্ক করেছে বিশ্ব ব্যাংক। বিশ্ব ব্যাংকের এক হিসাবে, খাদ্যপণ্যের দাম লাফিয়ে বেড়ে যেতে পারে এবং সেটা সর্বোচ্চ ৩৭ শতাংশ হতে পারে।

জ্বালানি সংকট (Fuel Crisis):

- ⇨ রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম প্রধান তেল উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক দেশ। তাই যুদ্ধ শুরুর পর দেশটির তেল সরবরাহ বাধাগ্রস্থ হবে এই আশঙ্কা থেকে বিশ্ব বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়তে শুরু করে। যা এক পর্যায়ে ১৩৯.১৩ ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়। এটি ১৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের জীবন কঠিন হয়ে গেছে।
- ⇨ ইউরোপের মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার ৪০ শতাংশ এবং জ্বালানি তেলের এক-তৃতীয়াংশ রাশিয়া একাই সরবরাহ করে। তাই রাশিয়া যদি গ্যাস ও জ্বালানি তেল সরবরাহে হস্তক্ষেপ করে, ইউরোপের অর্থনীতি যে চরম জ্বালানি সংকটে পড়বে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যার প্রভাব ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে।
- ⇨ ইউক্রেনের দনবাস হলো উন্নত কয়লার জন্য বিখ্যাত অঞ্চল। তাই কয়লার সংকটও এই যুদ্ধের কারণে সংঘটিত হয়েছে।

সার সংকট (Fertilizer Crisis):

- রাশিয়া নাইট্রোজেনভিত্তিক সারের বিশ্বের বৃহত্তম রপ্তানিকারক, পটাসিয়াম ও ফসফরাসভিত্তিক সারের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ। এছাড়াও রাশিয়া প্রচুর পরিমাণে পটাশ এবং ফসফেট উৎপাদন করে। এ দুটি সারের মূল উপাদান যা উদ্ভিদ ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সার সরবরাহ কমে গেছে এবং দাম বেড়েছে। সারের মূল্য বৃদ্ধি পেলে তার সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। যখন সারের দাম বৃদ্ধি পায় বা সরবরাহ ব্যাহত হয়, তখন এর প্রভাব সমগ্র বিশ্বব্যাপী খাদ্য ব্যবস্থায় অনুভূত হয়। এই ঘাটতির প্রভাব বিশ্বজুড়ে পড়লেও, দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

➢ Dutch Disease: [***]

Dutch Disease রোগের নাম তবে মানুষের কিংবা কোন প্রাণীর নয় বরং একটি দেশের অর্থনীতির রোগ। কোনো একটি বিশেষ সেক্টরের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর নির্ভরশীল থাকার নেতিবাচক দিকই হলো ডাচ ডিজিজ। সর্বপ্রথম ১৯৭৭ সালে *the Economist* ম্যাগাজিনে প্রথম ডাচ ডিজিজ শব্দের প্রয়োগ করা হয়। ১৯৫৯ সালের দিকে নেদারল্যান্ডসের শুধু প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর অর্থনীতির নেতিবাচক দিক নিয়ে ম্যাগাজিনটিতে আলোচনা করার পর থেকে ডাচ ডিজিজ প্রত্যয়টির প্রচারণা হয়। সম্প্রতি ভেনিজুয়েলায় তেল নির্ভর অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ায় ডাচ ডিজিজের প্রভাবে দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে।

কোন দেশের যে কোন একমুখী অর্থনৈতিক অবস্থা হলো ডাচ ডিজিজ। এ অবস্থায় অর্থনীতির একটি বিশেষ ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নতি এবং অন্য দিকে অন্যান্য ক্ষেত্রের পতন দেখা যায়। যার ফলে দেশীয় মুদ্রার মূল্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের পোশাক খাতের উপর অধিক নির্ভরশীলতার কারণে 'ডাচ ডিজিজ' এর বিষয়টি আলোচনায় আসে।

➢ প্রকৃতি ও প্রভাব:

ক. মুদ্রার মূল্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গিয়ে রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
খ. রাষ্ট্রের অর্থনীতি সীমিত সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।
গ. প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর অর্থনীতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
ঘ. কৃষি ও ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরগুলো ভেঙ্গে পড়ে।
ঙ. মুদ্রার মান স্থিতিশীল রাখতে অবমূল্যায়নের পথ গ্রহণ করতে হতে পারে, ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।
চ. সম্পদ কিছু মানুষের কাছে পুঞ্জীভূত হয়ে যায়।

➢ সরাসরি/ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (FDI):

বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হচ্ছে বাইরের কোন দেশ থেকে স্বাগতিক দেশে প্রকৃত মূলধন রপ্তানি। তবে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ঘটলেও, মূলধন স্থানান্তর নাও ঘটতে পারে। বহুজাতিক কোম্পানি নিজ দেশে মূলধন বিনিয়োগ না করে বরং স্থানীয় মূলধন/পরিসম্পদ অধিগ্রহণ করে বা তৃতীয় কোন দেশ থেকে মূলধন এনে বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটাতে পারে।

CIA এর "The World Factbook, ২০১২" উল্লেখ করে যে,

`FDI is the sum of equity capital, long-term capital and short-term capital.'

Financial Times এর মতে,

"কোনো একটি দেশের কোম্পানির অপরাপর রাষ্ট্রে মূলধন হস্তান্তর করে বাণিজ্য প্রসারিত বা নিয়ন্ত্রণ করাকে সরাসির বিদেশি বিনিয়োগ বলা হয়।"

প্রকৃত অর্থে, সরাসরি বা প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ দুইভাবে হতে পারে। যথা:

ক. অপরাপর দেশের কোম্পানি ক্রয় করে সরাসরি মূলধনী বিনিয়োগ বা স্থানান্তর করে

খ. নিজ দেশের কোনো বিদ্যমান কোম্পানির আকার বড় করে এর শাখা বিস্তারের লক্ষ্যে অন্য কোনো দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করে।

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ হলো একটি দেশের ব্যক্তি বা কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোন দেশের কোম্পানির স্বত্ব ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ। বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে নিয়োজিত কোম্পানিগুলোকে প্রায়শই অভিহিত করা হয়–

- বহুজাতিক কোম্পানি (MNCs)
- বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান (MNIs) ও
- আন্তর্দেশীয় কর্পোরেশন নামে (TNCs)

অর্থাৎ, সরাসরি বা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) হলো এমন একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, যখন কোনো একটি দেশের কোনো শিল্প উদ্যোক্তা বা ব্যক্তি অথবা কোম্পানি তার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে অপর কোনো দেশে বিনিয়োগ করে।

➢ Surveillance Capitalism:

Shoshana Zuboff's তার *The Age of Surveillance Capitalism* গ্রন্থে Surveillance Capitalism বা নজরদারি পুঁজিবাদের ধারণা দেন। গ্রন্থটি ২০১৯ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। নজরদারি পুঁজিবাদ হলো নব্য সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের বা ডিজিটাল বিশ্বব্যবস্থার বাজারই হলো নজরদারি পুঁজিবাদ।

Shoshana Zuboff's বলেন, "ভোক্তাদের আচরণের পূর্বাভাস জানা এবং আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কর্পোরেশনগুলোর শক্তিশালী অনুসন্ধানই হলো নজরদারি পুঁজিবাদ।"

তিনি নজরদারি পুঁজিবাদের (Surveillance Capitalism) নিম্নোক্ত **চারটি বৈশিষ্ট্যের** কথা বলেছেন–

ক. বেশি সংখ্যক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ
খ. কম্পিউটারাইজড মনিটরিং ও অটোমেশনের ব্যবহার
গ. ইলেকট্রনিক প্লাটফর্মের ব্যবহার
ঘ. প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ব্যবহার করে ব্যবহারকারী ও ভোক্তাদের উপর পরীক্ষা চালানো।

নজরদারি পুঁজিবাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ:

- ভোক্তাদের চাহিদার মূল্যায়নে ডাটা কালেকশন
- বিক্রয় প্রচেষ্টা জোরদার
- ফাইন্যান্সিয়ালাইজেশন
- ডেটা মাইনিং ও
- ইন্টারনেট ভিত্তিক একচেটিয়া পুঁজি সৃষ্টির মাধ্যমে

➢ Cryptocurrency বা ইলেক্ট্রনিক মুদ্রা: [**]

ক্রিপ্টোকারেন্সি হলো একধরনের সাংকেতিক মুদ্রা, যার কোনো বাস্তব রূপ নেই। ক্রিপ্টোকারেন্সির পুরো কার্যক্রম ক্রিপ্টোগ্রাফি নামক সুরক্ষিত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। এটি একধরনের payer to payer ব্যবস্থা। এতে তৃতীয় পক্ষের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। পরিচয় গোপন রেখেও এটা দিয়ে লেনদেন করা যায়। ক্রিপ্টোকারেন্সির উপর কোনো দেশের সরকারের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নাই। তাই পৃথিবীর অনেক দেশেই এ ডিজিটাল মুদ্রার উপর সেদেশের সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

উদাহরণ: বিটকয়েন, লাইটকয়েন, মোনেরো।

বৈশিষ্ট্য:

০১. লেনদেনের দ্রুততম প্রক্রিয়া
০২. প্রত্যেক ব্যবহারকারী তার ডিজিটাল মুদ্রার মালিক
০৩. একজন ব্যবহারকারী কয়েকটি একাউন্ট খুলতে পারেন। কারণ, একাউন্ট খুলতে নাম, ঠিকানা বা ব্যক্তিগত পরিচয় দিতে হয় না।
০৪. এটি সম্পূর্ণ অফেরৎযোগ্য।

এটি সাতোশি নাকামোতো ছদ্মনাম ব্যবহার করে একজন ব্যক্তি বা ব্যক্তির গোষ্ঠী দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত এর আবিষ্কারকের আসল পরিচয় অজানা রয়ে গেছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সি যেভাবে কাজ করে–

ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্লকচেইন (Blockchain) নামে একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজ করে। ব্লকচেইন একটি Decentralized technology, যা অনেক কম্পিউটার সম্মিলিতভাবে লেনদেন পরিচালনা করে এবং তার রেকর্ড রাখে। মাইনিং নামক একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি যাচাই করা হয় এবং ব্লকচেইনে রেকর্ড না করা পর্যন্ত লেনদেন চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হয় না। সাধারণত নতুন ক্রিপ্টোকারেন্সি টোকেনগুলো এভাবেই তৈরি হয়। ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটগুলো বিকেন্দ্রিত (Decentralized), যার অর্থ হলো এটা কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যেমন সরকার এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ।

এটি কম্পিউটারের একটি নেটওয়ার্ক জুড়ে চলে। তবে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কেনা বেচা করা যায় এবং 'ওয়ালেটে' সংরক্ষণ করা যায়। যখন কোনও এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কাছে ক্রিপ্টোকারেন্সি ইউনিট পাঠাতে চায়, সাধারণভাবে ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবহার করে।

সোজা কথায় ক্রিপ্টোকারেন্সি হল ডিজিটাল অর্থ (Digital Money), ব্লকচেইন হল একটি ডেটাবেস। যা উল্লিখিত ডিজিটাল অর্থের লেনদেন রেকর্ড করে। এই ডিজিটাল অর্থ কোনো সরকার বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা অনুমোদিত নয়।

➢ Backstop (ব্যাকস্টপ): [**]

ব্যাকস্টপ প্রত্যয়টি ব্রেক্সিটের সাথে জড়িত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করার পর ব্রিটেন কীভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ করবে। তার পরিকল্পনাই হলো Backstop. ব্যাকস্টপ ব্যবস্থার ধারণা দিয়েছিলেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে।

ব্যাকস্টপ হলো বিচ্ছেদের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত স্বাধীন আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের অংশ নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের সীমান্ত খোলা রাখার নিশ্চয়তা। এর ফলে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনের অধীনে থাকতে হবে। আয়ার্যলান্ড সীমান্ত নিয়ে যে চুক্তি হওয়ার কথা ছিল তার একটি ধারা হলো Backstop.

এই ধারার বিরোধীরা বলেছেন এতে আইনগতভাবে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্যের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। স্বাধীন আয়ারল্যান্ডের উপপ্রধানমন্ত্রী সায়মন কো ভেনি বলেছেন,

"তারা ব্যাকস্টপ ব্যবস্থার পরিবর্তন মেনে নিবে না।"

এর ফলে আয়ার্যলান্ড সীমান্তে সীমানা প্রাচীর এবং তল্লাশি চৌকি ফিরে আসার ঝুঁকি তৈরি হবে।

ব্যাকস্টপ শব্দটি ব্যবহারের মূল কথা হলো, দুই আয়ারল্যান্ডের মধ্যে কোনো হার্ড বর্ডার বা বাস্তব সীমান্ত থাকবে না, মানুষ ও পণ্যের অবাধ চলাচল আগের মতোই থাকবে।

➢ উরুগুয়ে রাউন্ড: [**]

গ্যাটের (GATT) উদ্যোগে বাণিজ্য ও শুল্কের ব্যাপারে যেসব পর্যায়ক্রমিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এটি তারই একটি। গ্যাট-এর তৎকালীন মহাপরিচালক আর্থার ডাংকেল-এর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে উরুগুয়েতে এই আলোচনাপর্ব শুরু হয় এবং ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর এক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার সমাপ্তি ঘটে। উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিলো–

ক. কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির ভর্তুকি কমানো হবে। মূল্যের উপর ৩৬% এবং পরিমাণের উপর ২১% আর আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে ৫০%
খ. শিল্পজাত পণ্যের উপর শুল্ক এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হবে এবং বাণিজ্য প্রবাহের ৪০% এর বেশি শুল্কমুক্ত হবে
গ. প্রত্যেক দেশ ব্যাংকিং ও পর্যটনসহ সেবামূলক খাতের বাণিজ্য উন্মুক্ত রাখবে

ঘ. টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস সামগ্রীতে ধনী দেশসমূহ কর্তৃক আরোপিত কোটা ১০ বছরের জন্য প্রত্যাহার করা হবে

ঙ. গ্যাট একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা বিধায় এর স্থলে বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠন (WTO) প্রতিষ্ঠা করা হবে

চ. বুটলেগিংসহ কপিরাইট চুরি ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ফিল্ম নকলের বিরুদ্ধে করা আইন প্রণয়ন করা হবে

ছ. বাণিজ্যসংক্রান্ত বিবিধ বিরোধ দ্রুত নিশ্চিত করা হবে

প্রকাশ থাকে যে, উরুগুয়ে রাউন্ডের মাধ্যমে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র খুশি হলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহ তেমন খুশি হয়নি।

➢ TRIMs: [**]

Trade Related Investment Measures. অর্থাৎ বাণিজ্য-সম্পর্কিত বিনিয়োগ-ব্যবস্থাদি। উরুগুয়ে রাউন্ডে প্রস্তাবিত ট্রিমস-এর মূলকথা হচ্ছে, কোনো দেশ তার নিজের দেশের কোম্পানি ও বিদেশি কোম্পানির মধ্যে কোনো ভেদাভেদ বা বৈষম্য করতে পারবে না; বরং উভয়ের ক্ষেত্রে একইরূপ সুযোগ-সুবিধাই দিতে হবে। ১৯৯৪ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ট্রিমস গ্রহণ করে।

Companyr surokkha

➢ TRIPs: [**]

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights বা TRIPs হচ্ছে বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব চুক্তি। মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও নকল পণ্যের বাণিজ্য নিরোধ আন্তর্জাতিক পরিসরে সকল সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আইনগত সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই চুক্তি বাস্তবায়িত হবে। শিল্পী, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের ট্রেড মার্ক ইত্যাদিকে এই চুক্তি আন্তর্জাতিক পরিসরে রক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে। জাতিসংঘের মেধা সংরক্ষণ সংস্থা (WIPO) ট্রিপস মর্যাদা প্রদান করলেও তা নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)। ১৯৯৪ সালে TRIPs চুক্তি হয় এবং ১৯৯৫ সালে কার্যকর হয়। পেটেন্ট (Patent) ও কপিরাইট (Copyright) এই ২ ভাবে ট্রিপস কার্যকর হয়।

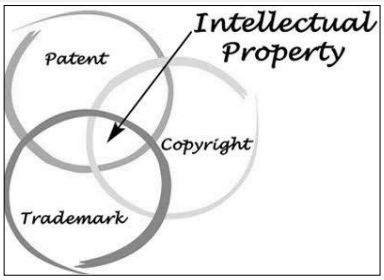

Biniyogkarir Surokkha

বৈশিষ্ট্য:

১. ট্রিপস একটি মেধাস্বত্ব আইন।

২. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক লিগ্যাল এগ্রিমেন্ট।

৩. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সকল সদস্য দেশের মধ্যে বৈধ চুক্তিই ট্রিপস।

৪. এই চুক্তির মাধ্যমে ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, পেটেন্ট ডিজাইনসহ মেধাস্বত্বের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়।

৫. বুদ্ধিবৃত্তিজাত সম্পদের অধিকার রক্ষায় ন্যূনতম মান নিশ্চিত করতে এই চুক্তি করা হয়।

➢ সংরক্ষণবাদ (Protectionism): [**]

অবাধ বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধ মতবাদই সংরক্ষণবাদ। সংরক্ষণবাদে দেশীয় পণ্যের সুবিধা ও বিদেশি পণ্যের আমদানিতে নিরুৎসাহিত করা হয়।

Policies of Protectionism:

ক. **শুল্ক আরোপ:** বিদেশি পণ্য আমদানিতে নিরুৎসাহিতকরণের জন্য সরকার অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক আরোপ করে। এর ফলে বিদেশি পণ্য আমদানিতে বাধা সৃষ্টি হয় এবং সংরক্ষণবাদ বাস্তবায়িত হয়।

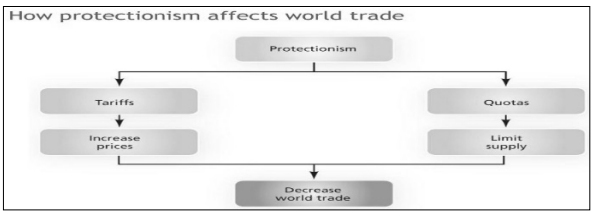

খ. **কোটা আরোপ:** বিদেশি পণ্য প্রবেশে সময়, সংখ্যা বা পণ্যের মূল্য নির্ধারিত করে দিলে বাণিজ্যে কোটা বলা হয়। এর ফলে বিদেশি পণ্য প্রবেশে নিরুৎসাহিত হয়।

গ. **ডাম্পিংবিরোধী আইন (Anti Dumping Law):** বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ডাম্পিংবিরোধী আইন চুক্তিতে নিয়ে আসা যাতে তদ্রুপ দেশীয় পণ্যের চেয়ে বিদেশি পণ্যটি কম দামে বিক্রি না হয় এবং বিক্রি করলে শাস্তি সম্পর্কে সচেতন করা। এতে বিদেশি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যে নিরুৎসাহিত হবে এবং সংরক্ষণবাদ বাস্তবায়ন হবে।

ঘ. **সরকারি ভর্তুকি:** দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিতকরণের জন্য সরকার দেশীয় পণ্যে ভর্তুকি প্রদান করে। এর ফলে বিদেশি পণ্য প্রবেশে নিরুৎসাহিত হয়।

ঙ. **প্রশাসনিক বাধা:** প্রটেকশনিজম বাস্তবায়নের জন্য বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিরুৎসাহিতকরণে সরকার বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি করে। যেমন, অপ্রতুল বিদ্যুৎ সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি না করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দেশের মানুষকে নিরুৎসাহিতকরণ ও খাদ্য সংকটের মত বাধা সৃষ্টি করে বিদেশি পণ্য প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

➢ Embargo and Sanction পার্থক্য [**]

Embargo	Sanctions
▪ Embargo হলো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আইনস্বরূপ। ▪ Embargo শব্দের অর্থ নিষেধাজ্ঞা। নিষেধাজ্ঞা হলো এক দেশের সাথে অন্য দেশের বাণিজ্য নিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধকরণ। ▪ নিষেধাজ্ঞাগুলোর অধীনে, নিষিদ্ধ দেশ থেকে বা কোনো পণ্য বা পরিসেষ আমদানি বা রফতানি করা যায় না। ▪ **উদাহরণ:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা রয়েছে (কিউবায় খাদ্য ও কৃষি পণ্য রফতানির মতো সীমিত পরিস্থিতি বাদে)।	▪ Sanction হলো শাস্তিস্বরূপ। ▪ Sanction হলো এক বা একাধিক দেশ একটি লক্ষ্যযুক্ত স্ব-শাসনকারী রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা পৃথক ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা আর্থিক বা আর্থিক জরিমানা। ▪ বাণিজ্যের বা আন্তর্জাতিকভাবে কোনো আনুষ্ঠানিকতা ভঙ্গকারী রাষ্ট্রকে শাস্তিস্বরূপ বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা Sanction এর অন্তর্ভুক্ত। ▪ **উদাহরণ:** উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক কর্মসূচি স্থগিত না করায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ যদি অবরোধ আরোপ করে, তা হবে Sanction.

➢ জিএসপি প্লাস (GSP Plus): [***]

জিএসপি হলো অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যিক সুবিধা। স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) জিএসপি প্লাস সুবিধা প্রদান করে থাকে। আর WTO ছাড়া অন্য কোন সংস্থা যদি জিএসপি সুবিধা প্রদান করে থাকে তখন তাকে GSP Plus সুবিধা বলে। তবে বর্তমানে শুধু ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) জিএসপি প্লাস কর্মসূচি প্রদান করছে।

জিএসপি প্লাস সুবিধা পাওয়ার শর্তগুলো নিম্নরূপ:

- ▶ রপ্তানিকারক দেশগুলো থেকে EU'তে মোট আমদানির চেয়ে রপ্তানি ১০% এর কম হলে জিএসপি সুবিধা পাবে।
- ▶ স্বল্পোন্নত দেশগুলো (LDC) থেকে মুক্ত হয়ে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়া দেশে প্রদান করা হয়।
- ▶ ইউরোপে রপ্তানির ক্ষেত্রে ২৭টি শর্ত পালনের পর জিএসপি প্লাস সুবিধা পাওয়া যাবে।
- ▶ বাংলাদেশের জিএসপি প্লাস পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে ইইউভুক্ত দেশগুলোর মোট আমদানির ১০ শতাংশ অতিক্রম করেছে। ফলে এ নীতিমালার কারণে বাংলাদেশকে ইউরোপ জিএসপি প্লাসের সুবিধা দিতে পারবে না। তাই বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের মত স্বাভাবিক হারে শুল্ক পরিশোধ করতে হবে।
- ▶ বাংলাদেশ অস্ত্র বাদে সব পণ্যে ইইউভুক্ত ২৮টি দেশে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, বাংলাদেশের রপ্তানির ৬০% যায় ইইউভুক্ত দেশগুলোতে এবং ইউরোপে বাংলাদেশের রপ্তানির মধ্যে ৮৫% গার্মেন্টস পণ্য।

প্যারা শুল্ক (Para tariff) [**]	অশুল্ক বাধা (non-tariff barriers) [**]
Para tariff বলতে বুঝায় আমদানিকৃত পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বা কর।	Non-tarrif (barriers) হলো বাণিজ্য বাধা, যা শুল্কের বাধা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য বা পরিষেবার আমদানি বা রপ্তানিকে সীমাবদ্ধ করে।
পরোক্ষ কর ও চার্জ, যা একইভাবে অভ্যন্তরীণ পণ্যের উপর আরোপ করা হয়, তাকে প্যারা ট্যারিফ বলা হয়।	কোটা আমদানি লাইসেন্স ব্যবস্থা ও স্যানিটারি রেগুলেশনের মত বিষয়াদি বুঝায়, যার উদ্দেশ্য হলো আমদানি নিয়ন্ত্রণ তথা বাণিজ্য সংকুচিত করা।
বিশেষ সেবার ক্ষেত্রে ধার্যকৃত আমদানি শুল্ক (Import charge) কে প্যারা-ট্যারিফ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয় না।	নন-ট্যারিফের ধারণা একদেশ হতে অন্য দেশে আলাদা হতে পারে।
উদাহরণ: সীমান্ত চার্জ, পণ্য মূল্যের উপর ধার্যকৃত কর এবং	**উদাহরণ:** Embargo, Sanction, Levish, রপ্তানি ভর্তুকি, ঋণ

অন্যান্য ফি প্রভৃতি।	ভর্তুকি, আমদানি কোটা, স্বেচ্ছা রপ্তানি সংযম, কঠোর কাস্টমস প্রসিডিউর, লাক্সারি ট্যাক্স, সেফগার্ড ডিউটি প্রভৃতি

➢ বৈশ্বিক দরিদ্র পরিস্থিতি (Global Poverty): [**]

দরিদ্রতা, অসমতা, অসম উন্নয়ন বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন কোন বিষয় নয়। বৈশ্বিক দরিদ্রতা বা অসমতা কোন স্বাভাবিক বিষয় নয়, এটা এমন কোন বিষয়ও নয় যে চাইলে নিবারণ করা যাবে না।

নতুন বৈশ্বিক দারিদ্র্যসীমা:

২০২২ সালে বিশ্বব্যাংক নতুন দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করেছে। নিম্ন-আয়ের দেশগুলোর জন্য ৮২.১৫, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য ৮৩.৬৫ এবং উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশগুলোর জন্য ৮৬.৮৫ সাধারণ জাতীয় দারিদ্র্যরেখাকে প্রতিফলিত করে। একই সাথে চরম দারিদ্র্যের নতুন সীমানা নির্ধারণ করেছে। নতুন সীমা অনুযায়ী যাদের দৈনিক আয় ২ ডলার ১৫ সেন্ট থেকে কম তারা চরম দারিদ্র্য সীমা বসবাস করছেন বলে ধরে নেয়া হবে (পূর্বে ছিল ১ ডলার ৯০ সেন্ট)।

বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য:

- বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাস ২০১৫ সাল থেকে ধীরে ধীরে হয়ে আসছিল। কিন্তু, করোনা মহামারি এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ সেই দারিদ্র্য হ্রাসের ফলাফলকে বিপরীতমুখী করে দিয়েছে।
- ২০১৫ সালের মধ্যে, বিশ্বব্যাপী চরম দারিদ্র্যের হার অর্ধেকেরও বেশি কমে গিয়েছিল। তারপর থেকে, দারিদ্র্য হ্রাস বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মতই তাল মিলিয়ে ধীর হয়ে গেছে।
- কোভিড-১৯ এবং পরবর্তীতে ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে অর্থনীতি উত্থানের বদলে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখে ছুটেছে। যার ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করার আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবই হবে না।
- শুধু ২০২০ সালে চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৭ কোটিরও বেশি বেড়েছে। যা ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য পর্যবেক্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি।

➢ ঋণ সংকট (Debt crisis):

ঋণ সংকট এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে একটি দেশ তার সরকারি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম।

ঋণ কখন গ্রহণ করে?

১. যখন একটি দেশের রাজস্ব আয় দীর্ঘ সময়ের জন্য তার ব্যয়ের চেয়ে কম থাকে, তখন একটি দেশ ঋণ গ্রহণ করে।
২. যখন আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়, তখন সরকার ঋণ গ্রহণ করে।
৩. যখন কর রাজস্ব অপর্যাপ্ত হয়, তখন সরকার ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

যদি একটি সরকারের ঋণের বোঝা খুব বেশি হয়ে যায়, বিনিয়োগকারীরা তার ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে শুরু করে এবং তারা উচ্চতর ঝুঁকির জন্য উচ্চ সুদের হার দাবি করতে শুরু করে। এর ফলে সেই সরকারের জন্য ঋণ নেওয়ার খরচ বেড়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে বিনিয়োগকারীদের আস্থার আরো অবনতি হওয়ায় ও ঋণ নেওয়ার খরচকে উচ্চ স্তরে ঠেলে দেওয়ায়, সরকার তার বিদ্যমান ঋণ পরিশোধ করতে হিমশিম খায় এবং শেষ পর্যন্ত ডিফল্ট হয়ে ঋণ সংকটে পড়তে পারে।

একটি দেশ কিভাবে ঋণ সংকটে পড়ে?

১. সরকার ২ ভাবে ঋণ করে। যথা:

➲ বন্ড ছেড়ে দেশের নাগরিকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং

➲ বিদেশ থেকেও সরকার দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিতে পারে ও বিদেশি মুদ্রায় বন্ড ছেড়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

সরকারের এই ঋণকে বলা হয় সার্বভৌম ঋণ। দেশের ভেতরের ঋণ দেশীয় মুদ্রায় শোধ করা যায়। সরকার কর বাড়িয়ে, সুদের হার কমিয়ে, কিংবা চাপে পড়লে নতুন টাকা ছাপিয়ে সেই ঋণ সামাল দিতে পারে। কিন্তু বিদেশি ঋণ শোধ করতে হয় বিদেশি মুদ্রায়। ফলে দরকার হলে আয়বর্ধক বিনিয়োগের খাত থেকে ডলার সরিয়ে সেই ঋণ শোধ করতে হয়। পরিস্থিতি তখন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

২. আন্তর্জাতিক তারল্য প্রবাহের স্রোত বদলে গেলে কিংবা রাজস্ব আদায়ে বিঘ্নিত হলে সরকার তহবিল সংকটে পড়ে।
৩. বিদেশি ঋণ নিয়ে একটি দেশ ঝুঁকির মধ্যে আছে কিনা, তা বিচার করা হয় ঋণ-জিডিপি অনুপাত দিয়ে। সাধারণত উচ্চ ঋণ-জিডিপি অনুপাত একটি দেশের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত এবং খেলাপি হওয়ার উচ্চ ঝুঁকি নির্দেশ করে।
৪. ঋণ নেওয়ার পর তা কাজে লাগানোর অদক্ষতা বা খামখেয়ালি পদক্ষেপ সেই দেশকে ঋণ সংকটে নিপতিত হওয়ার পথে নিয়ে যায়।

বর্তমান বৈশ্বিক ঋণ সংকট:

১. মূল্যস্ফীতি ও সুদের হার কম থাকা অবস্থায় গত এক দশকে অনেক উন্নয়নশীল দেশে জমেছে ঋণের পাহাড়। এর মধ্যে সিংহভাগ ছিল কোভিড সংশ্লিষ্ট ব্যয়। রাশিয়ার আক্রমণ এবং তাদের ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে খাদ্য ও জ্বালানির মূল্য বাড়তে শুরু করলে, বেশিরভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যস্ফীতি ঠেকাতে সুদের হার বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়।

২. শ্রীলঙ্কা ঘোষণা দিয়েছে, তারা বিদেশি ঋণ পরিশোধ করবে না। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে জরুরি আর্থিক সহযোগিতাও চেয়েছে দেশটি। ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কাকে প্রায় ৬০০ কোটি ডলার বিদেশি ঋণ শোধ করতে হবে, অথচ বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে মাত্র ১৫ কোটি ডলার, যা তাদের ইতিহাসে সর্বনিম্ন। এছাড়া ২০২৩ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে শ্রীলঙ্কাকে আরও আড়াই হাজার কোটি ডলারের বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

৩. চরম দারিদ্র্য এড়াতে এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করার সুযোগ দিতে বিশ্বের অর্ধেকের বেশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাস এমন ৫৪টি দেশের জরুরি ভিত্তিতে ঋণ সহায়তা প্রয়োজন বলে নতুন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)।

ঋণ সংকটের উদাহরণ:

শ্রীলংকা ও লেবানন দেউলিয়া হয়েছে। এর মধ্যে শ্রীলংকা নিজেকে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে নিম্ন আয়ের দেশে অবনমন করেছে।

➢ RCEP [***]

❖ **RCEP**: Regional Comprehensive Economic Partnership

❖ **পরিচয়:** এশিয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৫টি দেশকে নিয়ে গঠিত বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্য ব্লক। কারণ, এর রয়েছে–

➲ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৩০% এবং

➲ বিশ্বের মোট জিডিপির ৩০%।

বিশ্লেষকরা মনে করেছেন, নতুন এই জোট বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তুলবে। আর এই জোট গঠনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে এশিয়ায় বাণিজ্যের নীতি এবং শর্ত নিয়ন্ত্রণ করবে চীন। বাণিজ্য ও বিনিয়োগে বাংলাদেশের প্রতিযোগী রাষ্ট্রগুলোর বেশিরভাগ এই চুক্তিতে থাকায় এর প্রভাব পর্যালোচনা করছে সরকারি-বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগে প্রতিযোগী রাষ্ট্র ভিয়েতনাম, মিয়ানমার ও কম্বোডিয়ার মতো দেশগুলো এই চুক্তিতে থাকায় তারা রপ্তানি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আকর্ষণে আরও বেশি সক্ষমতা অর্জন করবে। সরকারের সংশ্লিষ্টরা অবশ্য রপ্তানি বাণিজ্যে তেমন ক্ষতি দেখছেন না। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উক্ত জোটে যোগ দিবে।

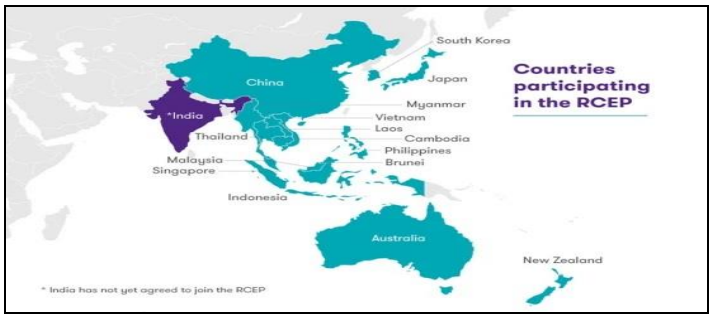

❖ **গঠন:** ১৫ নভেম্বর, ২০২০ সালের তারিখে ভিয়েতনামের হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত আসিয়ানের ৩৭তম সম্মেলনে

❖ **সদস্য:** ১৫টি (আসিয়ান ১০+ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীন)

❖ **নেতৃত্বে:** চীন

❖ **জোটের মূল লক্ষ্য:** বাণিজ্য শুল্ক কমানো, সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করা ও ই- কমার্সের জন্য নতুন বিধি বিধান চালু করা।

❖ **সিপিডির বিশ্লেষণ:** বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) মতে চীনের এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশে ৩ ধরনের প্রভাব পড়তে পারে–

১. চুক্তির দেশগুলোর মধ্যে শক্তিশালী সাপ্লাইচেইন গড়ে উঠবে, ফলে তাঁরা সস্তায় কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য সংগ্রহ করবে;

২. ফলে তাঁরা আরও কম মূল্যে পণ্য রপ্তানি করবে, যেটি বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে আরও বেশি প্রতিযোগতায় ফেলে দেবে এবং

৩. চুক্তিবদ্ধ দেশগুলো একে অপরকে বিনিয়োগ সুবিধা দেবে, ফলে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের মতো উন্নত দেশগুলোর বিনিয়োগের বেশিরভাগই যাবে মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনামের মতো দেশে, যা বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ সঙ্কুচিত করবে।

➢ CPTPP: [**]

The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP হলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য চুক্তি ও জোট। ২০১৫ সালের ৫ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় এই চুক্তিটি TPP নামে স্বাক্ষরিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই বাণিজ্য জোটটির প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল Trans- Pacific Partnership. চুক্তিটি কার্যকর হয় ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি।

☛ **সদস্য দেশ:** এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১১টি দেশ। যথা: কানাডা, চিলি, মেক্সিকো, পেরু, জাপান, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোক্তা হয়েও ২০১৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ত্যাগ করে। সম্প্রতি চীন,যুক্তরাজ্য ও থাইল্যান্ড সিটিপিপিতে যোগদানের আবেদন জানিয়েছে । চীন ২০২১ সালে ১৪ টি দেশ নিয়ে বিকল্প হিসাবে বৃহৎ বাণিজ্যিক জোট আরসিইপি গঠন করেছে।

☛ **উদ্দেশ্য:** বিশ্বের বৃহত্তম মুক্ত বাজার গড়া।

☛ **শক্তি:**

১. বিশ্ব জিডিপির ১৩%
২. জিডিপি– ১৩.৫ ট্রিলিয়ন [USMCA & EU এর পরই বৃহত্তম]
৩. রপ্তানির– ২৩% [যুক্তরাষ্ট্রসহ ৪০% ছিল]

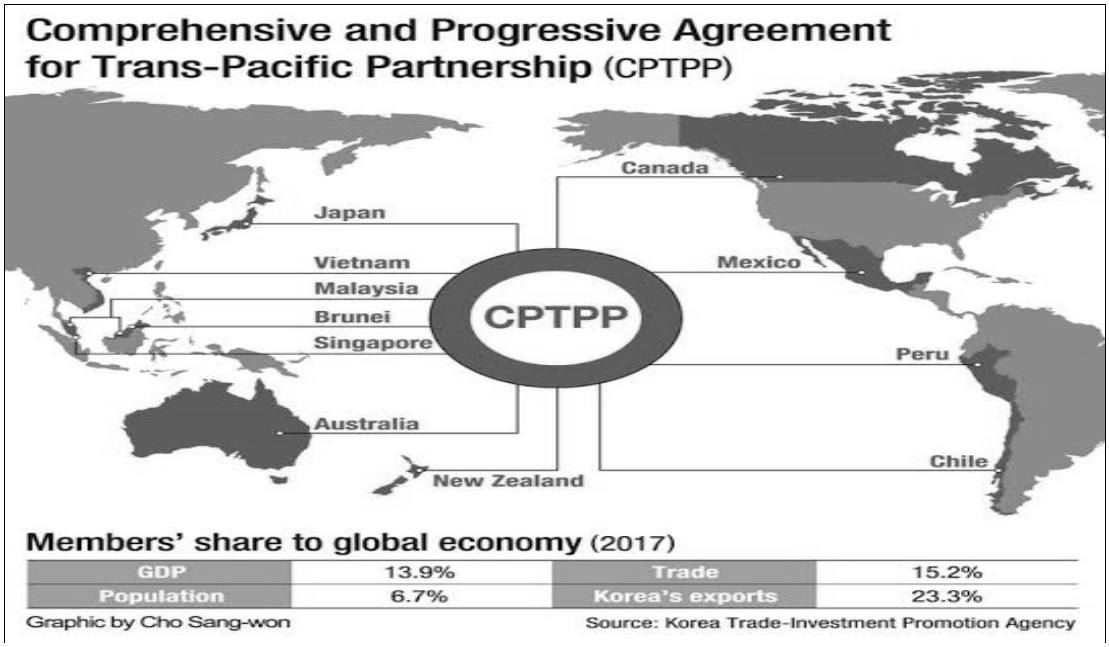

➢ **কর্মসূচি:**

ক. ১৮,০০০ পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে।
খ. তেল ও গ্যাস বাণিজ্যে কঠোরতা আরোপ।
গ. কপিরাইট সুবিধা ৭০ বছরের জন্য রাখা ।
ঘ. সরকার ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসণ।

➢ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা (PTA) [***]

PTA (Preferential Trade Agreement) বা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/ব্যবস্থা হলো একটি বাণিজ্যিক ব্লক, যা অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর কিছু পণ্যে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার দেয়। এটি শুল্ক কমানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে, কিন্তু সেগুলো সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে নয়। অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি হলো অর্থনৈতিক একত্রীকরণের প্রথম পর্যায়। অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বেশ কিছু নীতি মেনে চলে না।

২০২০ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ প্রথম ভুটানের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির ফলে ভুটান তৈরি পোশাক, কৃষি পণ্য এবং ইলেকট্রনিকস সহ ১০০টি বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক সুবিধা প্রদান করতে সম্মত হয়েছে। অন্যদিকে ফলমূলসহ ৩৪টি ভুটানিজ পণ্য বাংলাদেশে একই সুবিধা পাবে।

➢ SASEC:

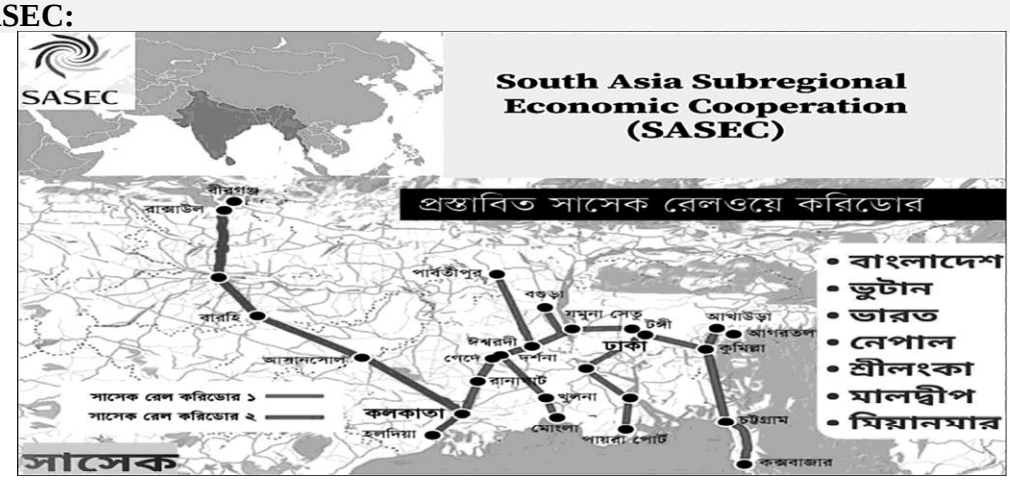

- **পূর্ণরূপ:** South Asia Subregional Economic Cooperation.
- **প্রতিষ্ঠা:** ২০০১ সালে
- **প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য:** ৪টি (বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও ভারত)
- **বর্তমানে সদস্য:** ৭টি (২০১৪ সালে শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ এবং ২০১৭ সালে মিয়ানমার যোগ দেয়)
- **সহায়তায়:** ADB
- **গঠনের উদ্দেশ্য:** দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে যোগাযোগ কানেকটিভিটি (Connectivity) তৈরি করা।

গঠনের পর প্রথম ১৫ বছর সাসেকের কার্যক্রম খুব একটা গতিশীল ছিল না। ২০১৬ সালে সদস্য দেশগুলো গ্রহণ করে Operational Plan 2016-2025. ১০ বছর মেয়াদি এ পরিকল্পনায় জোর দেয় পরিবহন, বাণিজ্য, জ্বালানি ও অর্থনৈতিক করিডোর উন্নয়নের দিকে।

⇨ **সাসেকের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব :**

ভারত ও জাপান দুটি দেশই বর্তমানে এশিয়া প্যাসিফিক চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে উচ্চাভিলাসী বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (BRI) মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব ঠেকাতে বদ্ধপরিকর। সেক্ষেত্রে SASEC -এ বিনিয়োগের মাধ্যমে এ অঞ্চলের অবকাঠামো খাতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে এডিবি।

⇨ **সাসেকের আওতায় বাংলাদেশে যে সব প্রকল্প :**

১. ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ। আগামি বছর কিছু অংশ চালু (বিমান বন্দর-বনানী)।
২. প্রস্তাবিত ঢাকা ইস্ট ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে- (কেরানীগঞ্জ -ফতুল্লা - বন্দর - ঢাকা) ৩৯.২৪ কিলোমিটার
৩. ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক চার লেন। দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ।
৪. চট্টগ্রামের কর্ণফুলী টানেল-পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতুর জন্য ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এক্সপ্রেসওয়ে।
৫. ঢাকা-চট্টগ্রাম ডাবল রেললাইন নির্মাণ ঢাকা-কক্সবাজার-গুণদম রেলপথ নির্মাণ।
৬. ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ।
৭. বেনাপোল-যশোর, রংপুর-বাংলাবান্ধা, বুড়িমারী-রংপুর, খুলনা-মংলা, ভাঙ্গা-বরিশাল, কুয়াকাটা, সিলেট-তামবিলসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।
৮. ইশ্বরদী থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত ডাবল লাইন, সিরাজগঞ্জ-বগুড়ার মধ্যে নতুন রেলপথ নির্মাণ, আব্দুলাপুর-পাবর্তীপুরের মধ্যে দ্বিতীয় রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প কাজ চলমান।

⇨ **সার্কের বিকল্প হিসেবে সাসেক :**

১. সার্ক দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের একটি আঞ্চলিক জোট, সার্কের সদস্যদেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার জন্য ২০১৬ সাল থেকে সংগঠনের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তাই বর্তমানে সার্কের সংকট কাটাতে এর বিপরীতে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের জোট ভাবা হচ্ছে সাসেককে।

২. সার্কের গঠনতন্ত্রে আছে, যদি ১টি সদস্যও সম্মেলন ত্যাগ করে, তাহলে সম্মেলন হবে না। তাই ২০১৪ সাল থেকে ঐকমত্য না থাকার কারণে সার্কের সম্মেলন স্থগিত আছে।

৩. সার্কের লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে অগ্রগতি এবং সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক মত পার্থক্য কমিয়ে আনার একটি উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান, বাংলাদেশ-পাকিস্তান এখনো আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব থেকে বের হতে পারেনি। আর সার্কের প্রথম লক্ষ্যই যেহেতু অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সেহেতু বিকল্প হিসেবে সাসেকই প্রাধান্য পাচ্ছে।

৪. সার্কের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা আলোচিত হতে পারে না। অপরদিকে সার্কের প্রধান সমস্যা হলো দ্বি-পাক্ষিক বৈরী সমস্যা। যেখানে পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশ, ভারতের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা আছে। কিন্তু সেই পাকিস্তানই SASEC-এ নেই।

৫. সার্কের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী শতভাগ হ্যাঁ ভোটে প্রস্তাব পাশ হয়। যেহেতু সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা রয়েছে, তাই প্রস্তাব পাশ অসম্ভব। কিন্তু সাসেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রস্তাব পাশ হয়। তাই সাসেক সার্কের বিকল্প হতে পারে।

৬. সদস্যদেশের পণ্য বাণিজ্যের ৯০% হয় সমুদ্রপথে। আর বিশ্বের বড় বাণিজ্যিক রুট হলো আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ চীন সাগর এই জলপথ, এই রুট ধরে বিশ্ব বাণিজ্য ৩০% পণ্য বাণিজ্য হয়। যার কারণে বঙ্গেপসাগরে গুরত্ব আগের তুলনায় বেশি।

৭. ২০১২ এবং ২০১৪ সালে যথাক্রমে মায়ানমার ও ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্র জয়ের পর বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের কর্তৃত্ব বেড়েছে, তাই বর্তমানে বাংলাদেশের কাছে সাসেকের গুরুত্ব বেশি।

➢ North-South Gap: [**]

সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে দক্ষিণের দেশ হিসেবে। অন্যদিকে শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোকে বলা হয় উত্তরের দেশ। সাংবাদিক ও সমাজবিজ্ঞানী ক্লার স্টার্লিং বলেন,

"কিছু গরিব দেশ আছে যারা পরিপূর্ণভাবে বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং
বিদেশি সাহায্যের সঞ্চালনের মাধ্যমেই এই দেশগুলো টিকে আছে।
মূলত তৃতীয় বিশ্বের মাঝে LDC ভুক্ত দেশগুলোকে দক্ষিণের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।"

উত্তর-দক্ষিণ বিশ্ব সম্পর্কে প্রথম সুস্পষ্ট উল্লেখ মিলে গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ প্রথম এ বিভাজনের কথা বললেও জার্মানির চ্যান্সেলর উইলি ব্র্যান্ড তার ঐতিহাসিক প্রতিবেদন 'The Brand Report' এ তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কে আলোচনায় সর্বপ্রথম বলেছিলেন, উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিশ্বের বিরোধ ও বিভাজন সম্পর্কে। এ দলিলে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছিল যে, এ সংশ্লিষ্ট বিভাজন পুরোপুরি বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক ক্ষমতা ও সম্পদের প্রভাব প্রতিপত্তির উপর ভিত্তি করে নকশাকৃত। এখানে আরও বলা হয়েছিল যে, উত্তরের রাষ্ট্রগুলো ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আর অন্যদিকে দক্ষিণের দুর্দশা ও দারিদ্র বেড়ে চলছে।
এ প্রসঙ্গে জয়ান্তানূজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

"উত্তর বনাম দক্ষিণের সংঘাত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
একটি বিষয় এবং যার মূলে আছে দুটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাহীন বৈপরীত্য।"

Real Gap between North-South State [***]

বিষয়	উত্তরের দেশ (ধনী দেশ)	দক্ষিণের দেশ (গরিব দেশ)
বিশ্বের মোট জনসংখ্যার হার	২৫%	৭৫%
জ্বালানি ব্যবহার	৮০%	২০%
বিশ্বের মোট শিল্পের	৮৬%	১৪%
শিল্প নিয়ন্ত্রণ	৬০%	স্বল্পোন্নত ৪৭টি দেশের নিয়ন্ত্রণে ০.২১%
বার্ষিক আয়	২৫০ কোটি মানুষের ৩৭.৯ ট্রিলিয়ন ডলার	৩০০ কোটি লোকের ৫ ট্রিলিয়ন ডলার
বৈদেশিক ঋণের সুদ দেয়	০৪%	১৭%
রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার	৮৫%	ডায়রিয়ায় মৃত্যু ৪৬ লাখ শিশুর
কৃষিতে শ্রমশক্তি	০৮%	৫০% এর অধিক
ন্যূনতম বেকারত্ব	০.৪%	৮০ কোটি বেকার
বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ	৮০%	১২.৯%

[তথ্যসূত্র: South South co-operation, 2014]

➢ শুল্ক (Tariff) [**]

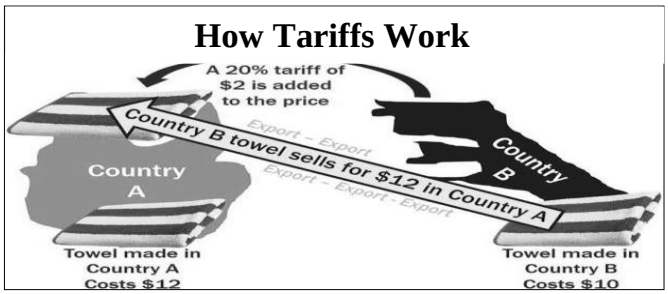

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কৌশলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে কোন না কোন পণ্যের জন্য অন্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আওতায় থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে দ্রব্য সামগ্রী আমদানি

করে থাকে। এ সকল আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর ওপর যে কর আরোপ করা হয়, তাকেই বলা হয় শুল্ক বা ট্যারিফ (*Tariff*) । ট্যারিফ বা শুল্ক সাধারণত ২ রকমের হয়ে থাকে।

১. **রাজস্ব শুল্ক (Revenue tariff)**: রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে শুল্ক ধার্য করা হয়, তাকে রাজস্ব শুল্ক বলে।
২. **সংরক্ষণমূলক শুল্ক (Protective tariff)**: বিদেশি পণ্যসামগ্রীর প্রতিযোগিতা থেকে দেশীয় শিল্পগুলোকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে যে শুল্ক আরোপ করা হয় তাকে সংরক্ষণমূলক শুল্ক বলে। কোন দেশ তার নিজের অর্থনৈতিক শক্তিকে প্রসারিত করার জন্য এই শুল্ক নীতি গ্রহণ করে। সংরক্ষণমূলক শুল্ক নীতি আমদানি হ্রাসে উৎসাহিত এবং বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয়ে সাহায্য করতে পারে। বিলাসদ্রব্য এবং বিদেশি পণ্যের আমদানি হ্রাস করে তার পরিবর্তে (*Substitute*) পণ্য উৎপাদনের জন্য সংরক্ষণমূলক শুল্ক নীতি প্রয়োগ করা যায়।

➢ বাণিজ্যে কোটা (Quota) [**]

কোন দেশ অন্য দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে পণ্য প্রবেশে শর্ত আরোপ করে দিলে তাকে বাণিজ্যে কোটা (Quota) বলে। বাণিজ্যিক সম্পর্কের দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক দুর্বল রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ক্ষতি সাধন করতে কোটা আরোপ করে থাকে।

বাণিজ্যে কোটা নিম্নোক্ত ৩ ভাবে হতে পারে–

১. বৈদেশিক পণ্য প্রবেশে পণ্যের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া।
২. বৈদেশিক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া।
৩. বৈদেশিক পণ্য প্রবেশে সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া।

ধরা যাক, বাংলাদেশ ভারত থেকে এমআরএফ টায়ার আমদানি করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যদি ভারতকে টায়ারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়, অথবা বলা হয় যে ৬ লাখের বেশি টায়ার বাংলাদেশ কিনবে না, অথবা যদি বলে দেয় যে বাংলাদেশ শুধু আগস্ট মাসে টায়ার আমদানি করে থাকে তাহলে তা হবে কোটা।

অধ্যাপক প্যাডেল ফোর্ড ও লিংকন বলেন,

`Quotas are essentially devices for Protecting domestic producers and conserving foreign exchange.'

অর্থাৎ দেশীয় উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণ বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের একটি বিশেষ কৌশল হল কোটা ব্যবস্থা।

➢ Duty (শুল্ক) [**]

আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পণ্যের ওপর যে চার্জ ধার্য ধরা হয়, তাকে Duty বা শুল্ক বলে।

⇨ **ডাম্পিং:** দেশীয় কোনো পণ্য দেশে যে দামে বিক্রি হয়, তার চেয়ে কম দামে বিদেশে রপ্তানি করাকে ডাম্পিং বলে। ডাম্পিংকে প্রতিরোধ করতেই এন্টি ডাম্পিং শুল্ক বসানো হয়।

⇨ **এন্টি ডাম্পিং ডিউটিং:** দেশীয় কোনো পণ্য দেশে যে দামে বিক্রি হয়, তার চেয়ে কম দামে যদি তা বিদেশে রপ্তানি হয়, তাহলে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যে শুল্ক আরোপ করা হয় তাকে এন্টি ডাম্পিং ডিউটি বলে। এটি আমদানি শুল্ক।

উদাহরণ: ২০১৭ সালের ৫ জানুয়ারি থেকে ভারত বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্য আমদানির উপর এন্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করেছে। ভারতের অভিযোগ, বাংলাদেশ ভারতের স্থানীয় বাজারের চেয়ে কম দামে রপ্তানি করছে। এর ফলে ভারতের পাটখাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ ভারতের।

⇨ **কাউন্টার ভেইলিং ডিউটি:** যে সব রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে সরকার ভর্তুকি দেয়, তার ওপর আমদানিকারক দেশ যখন কর বা শুল্ক আরোপ করে তখন তাকে কাউন্টার ভেইলিং ডিউটি বলে। এ ধরনের কর বা শুল্ক বসানোর কারণ হলো, ভর্তুকি পাওয়া রপ্তানি হওয়া পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও দাম কমে যায়। ফলে আমদানিকারক দেশের বাজারে ঐ পণ্যটির দামের তুলনায় সস্তা হয়ে যায়। তখন দামের সমতা আনতে Countervailing Duty বা CVT বসানো হয়। ন্যায্যতার দিক থেকে যে কোন দেশই এটা করতে পারে।

উদাহরণ: বাংলাদেশ থেকে পাট পণ্যের ওপর ভতুর্কি বা নগদ সহায়তা দেয়ায় কাউন্টার ডোইলিং ডিউটি আরোপ করে ভারত। ভারতে অনেক পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশকে ১২.৫ শতাংশ হারে কাউন্টার ভে ইলিং ডিউটি দিতে হয়।

➢ আন্তর্জাতিক কার্টেল (International Cartel):

কিছু সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য যৌথভাবে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সংঘবদ্ধ হলে সেই সংঘকে কার্টেল বলে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে একচেটিয়া স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কার্টেল গঠিত হয়। **যেমন:** তেল রপ্তানিকারকদের কার্টেল হলো OPEC.

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কৌশলের একটি হাতিয়ার হলো কার্টেল *(Cartel)*। বিভিন্ন স্বাধীন ব্যবসায়ী সংস্থা একত্রিত হয়ে একই ধরনের ব্যবসায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। তখন ঐ স্বাধীন ব্যবসায়ী সংঘকে কার্টেল বলা হয়। অধ্যাপক হুইটলেসির (Whittlesey) মতে,

"কার্টেল বলতে এক বা একই ধরনের ব্যবসায়ে লিপ্ত স্বতন্ত্র কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন সংঘকে বোঝানো হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রীর বাজারে প্রতিযোগিতার ওপর নিয়ন্ত্রণ চর্চা করা।"

আন্তর্জাতিক শিল্পের ক্ষেত্রে কার্টেলগুলো কার্যকরী হয়। কৃষি ক্ষেত্রে কার্টেলগুলোর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। শিল্পের মধ্যেও আবার বৃহদায়তন শিল্পে কার্টেলগুলো অধিকতর কার্যকর।

➢ ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) [**]

GI এর পূর্ণরূপ হলো Geographical Indication. এর বাংলা অর্থ ভৌগোলিক নির্দেশক। GI হলো একটি নাম বা সাইন যেটা নির্দিষ্ট একটি পণ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়, যা কোন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার (শহর বা দেশ) পণ্যের পরিচিতি বহন করে। এতে পণ্যটি ঐ দেশের পণ্য হিসেবে খ্যাতি পায় এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে নিজের অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের প্যাটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অথরিটি (DPDT) মেধাস্বত্ব বিষয়ক বৈশ্বিক সংস্থা World Intellecteal Property Organization (WIPO) এর তত্ত্বধানে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য নিবন্ধন দেয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের **১১**টি পণ্য GI স্বীকৃতি পেয়েছে–

পণ্য	সাল	পণ্য	সাল
জামদানি	২০১৬	রংপুরের শতরঞ্জি	২০২১
ইলিশ	২০১৭	কালিজিরা চাল	২০২১
ক্ষীরসাপাতি আম	২০১৯	দিনাজপুরের কাটারীভোগ	২০২১
ঢাকাই মসলিন	২০২০	নেত্রকোনার সাদামাটি	২০২১
রাজশাহী সিল্ক	২০২১	ফজলি আম	২০২১
বাগদা চিংড়ি			

➢ আঞ্চলিকতাবাদ (Regionalism):[**]

আঞ্চলিকতাবাদ গড়ে ওঠার কারণ:

১. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি:
২. দ্বি পাক্ষিক সম্পর্ক ও উন্নয়ন
৩. আঞ্চলিক ঐক্যবদ্ধতা
৪. সভ্যতার ঐক্যবদ্ধতা
৫. পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
৬. আন্তর্জাতিক সংগঠনে স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা
৭. রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতা
৮. ভৌগোলিক স্বার্থ রক্ষা
৯. বঞ্চিত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন
১০. ঐতিহাসিক কারণ

- **উপ-আঞ্চলিকতাবাদ:**

আঞ্চলিক সহযোগিতার ভেতরে দু'টি বা তিনটি রাষ্ট্র যখন অঞ্চলভিত্তিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলে, সেটাকেই আমরা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বলি। এর উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই সার্কের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপাল (BBIN) করিডরকে। এর মাধ্যমে এই রাষ্ট্রগুলোর মাঝে উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ তৈরি হবে। কেননা ভারতের সম্পূর্ণ অংশ এর অন্তর্গত নয়। উল্লেখ্য ভারতের ৫টি রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে। যার দৈর্ঘ্য মোট ৪,০৯৬ কিলোমিটার। এর মধ্যে–

- পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে– ২২১৬ কিলোমিটার
- ত্রিপুরার সঙ্গে– ৮৫৬ কিলোমিটার
- মেঘালয়ের সঙ্গে– ৪৪৩ কিলোমিটার
- মিজোরামের সঙ্গে– ৩১৮ কিলোমিটার এবং
- আসামের সঙ্গে– ২৬৩ কিলোমিটার রয়েছে।

এক্ষেত্রে BBIN-এর ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের যে প্রধান দুটি সমস্যা (জ্বালানি ও পানি), তা বিবিআইএন-এর সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। বিবিআইএন এ জ্বালানি সম্পদের এক বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে

ভুটান ও নেপালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বিবিআইএন হচ্ছে ভুটান, বাংলাদেশ, ভারত (সেভেন সিস্টার্স) ও নেপাল উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা।

➢ অর্থনৈতিক উদারতাবাদ (Financial Liberalization) [**]

কোন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং মুক্ত অর্থনীতির নীতি গ্রহণ করাই হলো অর্থনৈতিক উদারতাবাদ। বর্তমান যুগ হলো বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগ। বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে উৎপাদন ও শিল্পখাত দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু ও রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এক কথায় বলা যেতে পারে, অর্থনৈতিক উদারতাবাদ হলো সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা।

Kathleen (২০০৩) মনে করেন, অর্থনৈতিক উদারতাবাদের উপর ভিত্তি করে উদ্ভব হয়েছে–

ক. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন
খ. জনগণের অর্থনৈতিক অধিকার
গ. মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও মুক্তবাণিজ্য
ঘ. বেসরকারিকরণ
ঙ. ব্যক্তিগত মালিকানায় সম্পত্তির অধিকার

নিচে চীন ও ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার ও উদারনীতিবাদের চিত্র তুলে ধরা হলো:

- **চীন:**

মাও সে তুং এর মৃত্যুর পর চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করে। ১৯৭৮ সালে দেং জিয়ং পিং এর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে চীনের বাজার উন্মুক্তকরণ করা হয়। ৮০ এর দশকের শুরুতে কৃষিখাত সংস্কারের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয় এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়। ৯০ এর দশকে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ, বাণিজ্যে সংরক্ষণবাদ নীতি ইত্যাদি তুলে নেওয়া হয়। যার ফলে চীনের অর্থনীতি অতি দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করে।

- **ভারত:**

ভারতে স্বাধীনতার পর থেকে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের পরবর্তীতে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা (Capitalistic Economy) চালু রয়েছে। তবে এর পাশাপাশি কিছু সমাজতান্ত্রিক নীতি চালু ছিল। যেমন: সরকারি নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ও সংরক্ষণবাদ নীতির প্রচলন ছিল। ১৯৯১ সালে ভারতের অর্থনীতি ও বাজারকে আরো স্বাধীন ও মুক্ত করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে গত দুই দশকে দেশটি আরো অনেক বেশি সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং ভারত বর্তমান বিশ্বে উদীয়মান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

➢ এন্টি ডাম্পিং আইন (Anti Dumping Law): [**]

বিদেশি পণ্য দেশীয় বাজারের চেয়ে কম দামে বিক্রির নাম ডাম্পিং। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশ তাদের নিজেদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ডাম্পিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় এন্টি ডাম্পিং আইন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ৬নং অনুচ্ছেদে anti dumping সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

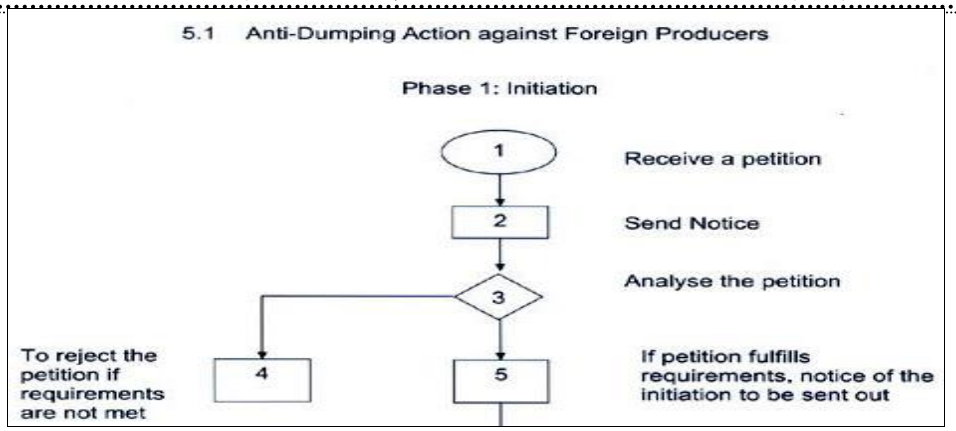

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তিতে উল্লেখ আছে, কোনো দেশের সরকার যদি মনে করে, তার নিজের দেশের শিল্প কারখানা হুমকির সম্মুখীন, তাহলে ঐ দেশ ডাম্পিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। কিন্তু শর্ত থাকে ঐ দেশের সরকারকে দেখাতে হবে যে–

⇨ অভ্যন্তরীণ বাজারের চেয়ে কত কম মূল্যে পণ্য রপ্তানি হচ্ছে এবং

⇨ তা কীভাবে অভ্যন্তরীণ শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

আমদানিকারক দেশ অভ্যন্তরীণ শিল্প কারখানাকে বাঁচানোর জন্য ডাম্পিং পদ্ধতিতে নির্ধারিত আমদানি দ্রব্যের উপর প্রয়োজনে অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করতে পারবে। অতিরিক্ত, এই শুল্ক কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের উপর প্রযোজ্য হবে।

➢ PATENT & Copyright: [***]

প্যাটেন্ট হলো এক ধরনের অধিকার। এই বিশেষ অধিকার সত্ত্বাধিকারীকে দেয়া হয়, কৃতীসত্ত্বাকৃত বস্তু যেন অন্য কেউ অনুমতিহীন উৎপাদন, ব্যবহার, বিক্রয় এবং বিতরণ না করতে পারে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত Patent Right দেয়া হয়। সাধারণভাবে মেয়াদটা ২০ বছরের মতো হয়। আবিষ্কার করা জিনিসটার ধরন অনুযায়ী মেয়াদ কম বেশি হতে পারে। সাধারণত প্যাটেন্ট করতে গেলে শর্ত দেয়া হয়, আবিষ্কারের বিষয়টা প্রকাশ্যে জমা দিতে হবে। আগে এই প্যাটেন্টের বিষয়টা রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন ছিল। পরে বিশ্ব শ্রম সংস্থা (ILO) এই নিয়ে একটি চুক্তি করল। সেই চুক্তি অনুযায়ী সংস্থাটির সব সদস্যকে প্যাটেন্টের অধিকার দিতে হবে।

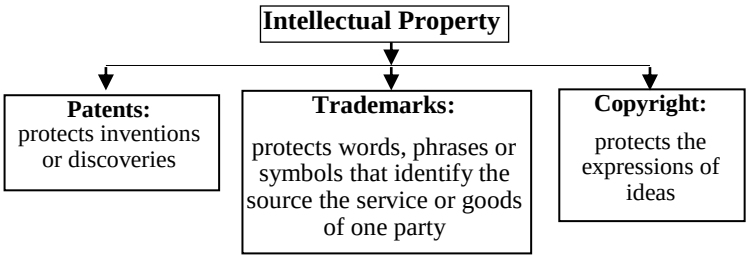

Copyright: সহজে বললে আবিষ্কার করা বিষয়টির সাথে যখন আবিষ্কারককে আলাদা করা যায় না, তখন তা কপিরাইট হয়। যেমন, একজন ভালো চলচ্চিত্র তৈরি করে। তার কল্পনা শক্তি ছাড়া ঐ চলচ্চিত্রকে পূর্ণতা দেয়া যায় না বলে তা হবে কপিরাইট।

Patent: সহজে বললে আবিষ্কার করা বিষয়টির সাথে যখন আবিষ্কারককে আলাদা করা যায়, তখন তা পেটেন্ট হয়। যেমন, মাকসুদুল আলম পাটের জিনতত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। তার এই তত্ত্ব ব্যবহার করে যে কেউ পাট উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাই এটি কপিরাইট না হয়ে পেটেন্ট হবে।

কপিরাইট [***]	**পেটেন্ট** [***]
১. কপিরাইট একটি আইনি অধিকার যা একটি মূল কাজের স্রষ্টা তার ব্যবহার এবং বিতরণের জন্য একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে। ২. কপিরাইট একটি সীমিত সময়ের জন্য দেয়া হয়।	১. পেটেন্ট এক ধরনের অধিকার। ২. পেটেন্টের মেয়াদ সাধারণত ২০ বছরের মতো হয়। ৩. পেটেন্ট করতে গেলে একটি শর্ত দেয়া হয় যে অধিকারের বিষয়টি প্রকাশ্যে জানাতে হবে। ৪. ট্রিপস চুক্তি অনুযায়ী বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সব সদস্য রাষ্ট্রকে পেটেন্টের অধিকার দিতে হবে।

৩. কপিরাইট একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি যা সৃজনশীল কাজের জন্য প্রযোজ্য। ৪. কপিরাইটের সময়কাল লেখকের মৃত্যুর পরও ৫০ থেকে ১০০ বছর থাকে।	৫. কোনো কিছু উদ্ভাবনের জন্য এটা অনুমোদন করা হয়। ৬. পেটেন্ট সুরক্ষার অর্থ হচ্ছে পেটেন্ট মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার উদ্ভাবনটি বাণিজ্যিকভাবে তৈরি, ব্যবহার, বিতরণ বা বিক্রি করা যাবে না। ৭. পেটেন্ট হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি। ৮. কপিরাইট সুরক্ষার জন্য সাধারণ কোনো কর্মকে রেজিস্ট্রিকৃত হতে হয় না।

➢ রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) [**]

আমদানি শুল্ক ধার্য করার লক্ষ্যে বিদেশ থেকে আমদানি করা কোনো পণ্য কোন দেশ থেকে এসেছে বলে বিবেচিত হবে, তা নির্ধারণ করার জন্য বিস্তারিত নিয়মকানুনকে রুলস অব অরিজিন বলা হয়।

একটি পণ্য সম্পূর্ণভাবে জন্মানো বা তৈরি করার পূর্ণ প্রক্রিয়া একটি দেশে করা হলে উৎপত্তি দেশ নির্ধারণের বিষয়টি খুব সহজ হতে পারে। কিন্তু, যখন একটি সমাপ্ত পণ্য অনেক দেশে উৎপন্ন উপাদানের মাধ্যমে তৈরি হয়, তখন উৎস নির্ধারণ করা আরও জটিল হতে পারে। উৎস নির্ধারণের নিয়ম খুব বিশদ এবং নির্দিষ্ট হতে পারে এবং চুক্তি থেকে চুক্তিতে এবং পণ্য থেকে পণ্যে পরিবর্তিত হতে পারে।

Rules of Origin এর সাহায্যে কোন পণ্যের উৎপত্তি দেশ নির্ধারণ করা হয়। এজন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন, বিধি ও প্রশাসনিক পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়। ঐ কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দেয় যে–

১) কোন পণ্যটি কোটার আওতায় পড়বে।
২) কোন পণ্যটি শুল্কের আওতায় পড়বে এবং
৩) কোন পণ্যটি Anti- Dumping Duty এর আওতায় পড়বে

Rules of origin এর গুরুত্ব:

১. রুলস অব অরিজিন শিথিল হলে রপ্তানিকারকদের জন্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তা সুবিধাজনক হয়। জটিল রুলস অব অরিজিন রপ্তানিকারকদের কাজকে জটিল করে ফেলে। উদাহরণ রয়েছে যে রুলস অব অরিজিনের জটিলতার কারণে কোনো কোনো সময়ে কিছু দেশের রপ্তানিকারকরা কোনো অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সুবিধা না নিয়ে সাধারণভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম মেনেই পণ্য রফতানি করেছে।

২. ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ডব্লিউটিওর বালি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এলডিসি দেশগুলো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি কাঁচামাল ব্যবহার করতে পারবে। তবে সদস্য দেশগুলো এটি মানতে বাধ্য নয়। বর্তমানে ইইউ সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি কাঁচামাল ব্যবহার করলে তাতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়।

৩. রুলস অব অরিজিন এবং শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা রপ্তানিকে বেশ প্রভাবিত করে।কাঁচামালের উৎস বিধি শর্ত শিথিল করার আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) কম্বোডিয়ার রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১১ শতাংশ, শিথিল করার পর তা দাঁড়িয়েছে ৩৬ শতাংশে। লাওসের প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৪ শতাংশ, জাম্বিয়ার প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ থেকে ২৯ শতাংশ হয়েছে। আর বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ শতাংশে।

Global Environment

[সিলেবাস: Environmental issues challenges, climate change, global warming, climate adaptation, climate diplomacy]

অনুসরণীয়: এই অধ্যায়টি তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ। তবে Loss & Damage, COP-27, SDGs & Climate Diplomacy বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত প্রশ্ন:

৪১তম: চরম আবহাওয়ার ভয়াবহতাগুলো কী কী?

আবহাওয়া যখন তার স্বাভাবিক প্রকৃতি পরিবর্তন করে চরম ও বিরূপ আকার ধারণ করে তখন তাকে চরম আবহাওয়া বলে। চরম আবহাওয়ার পিছনে জলবায়ু পরিবর্তনকেই দায়ী করা হয়।

আবহাওয়াবিদদের মতে চরম আবহাওয়ায় মূলত অপ্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক, মারাত্মক ও অসময়ের আবহাওয়া বিরাজমান থাকে যা পূর্বে দৃশ্যমান ছিল না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তীব্র গরম, খরা, বন্যা ও অতিবৃষ্টি বিরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাবে- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ডসহ ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে স্মরণকালের ভয়াবহ দাবানল heat dome দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে কোথাও কোথাও বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, তুষারঝড় হচ্ছে। চীন-ভারত-নেপাল-পাকিস্তানে আকস্মিক বন্যা-ভূমিধস, ভারতের কেরালা-মহারাষ্ট্রে প্রলয়ংকারী বন্যা, সৌদি আরবে আকস্মিক অতিবৃষ্টি-বন্যা ছাড়াও মরুদেশটিতে তুষারপাত হয়েছে।

চরম আবহাওয়ার ভয়াবহ প্রভাব:

১. **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি:** বিশ্বব্যাপী বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। এতে এসব অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেবে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার লাখ লাখ লোক 'পরিবেশগত উদ্বাস্তু'তে পরিণত হবে। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম এবং ফিলিপাইনে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ বসবাস করে।

২. **তীব্র তাপদাহের প্রবণতা:** ভারত ও পাকিস্তান ২০২২ সালে ৫ বার তাপদাহের মুখে পড়েছে। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। অপরদিকে যুক্তরাজ্যের তাপমাত্রা ইতিহাসে প্রথমবারের মত ৪০ ডিগ্রিতে উঠে যায়।

৩. **বাড়ছে খরা:** তাপদাহ যত বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খরা। তীব্র গরমে যখন বৃষ্টির দেখা মেলে না, মাটি হারায় আর্দ্রতা, দেখা দেয় পানির অভাব। পূর্ব আফ্রিকায় খরার প্রভাবে দুর্ভিক্ষ ও মানব বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

৪. **বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়:** চরম আবহাওয়ার কারণে ঘন ঘন, দীর্ঘমেয়াদি ও রেকর্ড ভঙ্গকারী বন্যা সংঘটিত হচ্ছে। চরম আবহাওয়ার ফলে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় যেমন: হারিকেন, টাইফুন বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় সৃষ্টি হয়।

৫. **দাবানল:** জলবায়ু বদলের কারণে যে চরম গরম আবহাওয়া চলছে, তা মাটি ও গাছপালা থেকে আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে। এই শুকনো দশা বনে আগুনের রসদ যোগায়। ২০২২ সালে ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, গ্রিস, ক্রোয়েশিয়া, আলবেনিয়ায় ভয়াবহ দাবানল দেখা গেছে গত কিছু দিনে।

৬. **অতিবৃষ্টি:** আবহাওয়া যত উষ্ণ হবে, জলীয়বাষ্প ততই বাড়বে। তাতে ভারি বৃষ্টি বাড়বে। ব্রিসবেনে বছরে যা বৃষ্টি হয়, তার ৮০ শতাংশ হয়ে গেছে মোটে ৬ দিনে। সিডনিতে বছরের গড় বৃষ্টিপাতেরও বেশি বৃষ্টি হয়ে গেছে ৩ মাসেই।

৭. **আর্থিক ক্ষতি:** গরম আবহাওয়ার কারণে ২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৩২৯ বিলিয়ন ডলার।

৮. **খাদ্যশস্য উৎপাদন হ্রাস:** ১ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়ার কারণে বিশ্বব্যাপী গম উৎপাদন ৬% এবং ধান উৎপাদন ১০% হ্রাস পেয়েছে বলা হয়েছে ল্যানসেটের গবেষণায়।

৯. **প্রাণী জগতে বিরূপ প্রভাব:** বরফ গলতে থাকায় Polar Bear বা উত্তর মেরুর শ্বেত ভাল্লুকের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি আটলান্টিক মহাসাগরের স্যামন মাছ বিপন্ন হবে। কারণ যেসব নদীতে ঢুকে তারা ডিম পেড়ে বাচ্চার জন্ম দেয়, সেগুলোর পানি গরম হয়ে যাচ্ছে।

৪০তম: জলবায়ু শরণার্থী (Climate refugee) বলতে কী বোঝায়?

ভপরিবেশ বিশারদ ও গবেষক Myers & Kent সংজ্ঞায়িত করেন যে,

"যেসব লোক কোনো স্বাভাবিক পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে তাদের ঐতিহ্যগত বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয় এবং নিরাপদ জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না, তারাই পরিবেশগত শরণার্থী।"

জলবায়ু শরণার্থী ৩ ভাবে হয়ে থাকে–

১. মরুকরণ প্রক্রিয়ায় যারা বাস্তুচ্যুত হবে।
২. সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে যারা বাস্তুচ্যুত হবে।
৩. পরিবেশগত সংঘাতের কারণে যারা বাস্তুচ্যুত হবে।

জলবায়ু গবেষক Sukrhe এর মতে জলবায়ু শরণার্থী সৃষ্টির কারণ:

ক. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি খ. মরুকরণ গ. খরা
ঘ. ভূমিক্ষয় ঙ. পানি চ. বায়ুদূষণ

২০২১ সালের IPCC এর Sixth Assessment Report -এ বলা হয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে ২০৫০ সাল নাগাদ ৪ কোটি জলবায়ু শরণার্থী হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের জলবায়ু পরিবর্তনে বাস্তুচ্যুত রিপোর্ট- ২০২১ অনুযায়ী [সর্বশেষ জলবায়ু শরণার্থী]

- ◈ **২০৫০ সালের মধ্যে বাস্তুচ্যুত হবে** : ২১.৬০ কোটি।
- ◈ **দক্ষিণ এশিয়ায় বাস্তুচ্যুত হবে** : ৪ কোটি
- ◈ **সবচেয়ে বেশি বাস্তুচ্যুত হবে** : ৮.৬০ কোটি [সাব-সাহারায়]
- ◈ ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন কমানো এবং সবুজ, অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থিতিস্থাপক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিবাসনের হার– ৮০% কমানো সম্ভব।

৩৭তম: কপ (COP) ২২ মূল সিদ্ধান্তগুলি কী কী?

উত্তর: এখন দরকার নেই [কপ-২৭ জানতে হবে]

সিলেবাস অনুযায়ী এই অধ্যায়ের বিষয়সমূহ

➢ জলবায়ু পরিবর্তন [**]

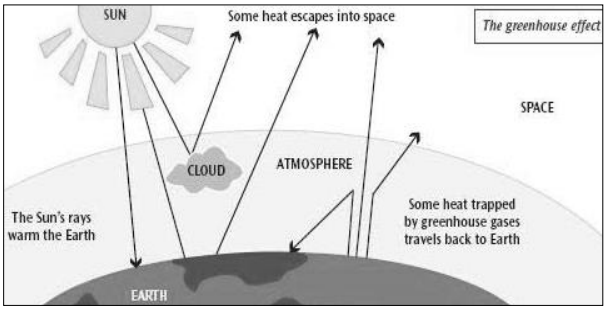

বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন অন্যতম আলোচিত একটি ইস্যু। প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে মানুষের জীবনযাত্রার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। জীবন ও পরিবেশের এই সম্পর্ক এক ও অভিন্ন। জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার এক গুরুতর উৎকণ্ঠার কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘদিনের (৩০ বছর বা তারও বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়ার পর্যালোচনা করে জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

বায়ুমণ্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থাকে জলবায়ু বলা হয়। আর ভৌত উপাদানগুলোর অস্বাভাবিকতা ঘটলে জলবায়ু পরিবর্তন হয়।

ভৌত উপাদান: বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহ, বায়ু আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি

জলবায়ু পরিবর্তন যেসব নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল: জৈব প্রক্রিয়াসমূহ, ওজনস্তর ক্ষয়, কীটনাশক ব্যবহার প্রভৃতি।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক পরিবেশে যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে সেগুলো হলো:

জাতিসংঘের আইপিসিসি সিক্সথ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট

- **প্রকাশ:** ৯ আগস্ট, ২০২১
- **প্রকাশ করেছে:** IPCC
- **জাতিসংঘ মহাসচিব প্রতিবেদনটিকে অভিহিত করেন:** Code Red for Humanity বা মানবতার জন্য লাল সংকেত হিসেবে
- **প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে:**

⇨ ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে এবং ৫০ বছরের মধ্যে তাপমাত্রা বাড়বে ২ ডিগ্রি
⇨ ২০১১-২০২০ দশকে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১৮৫০-১৯০০ সময়কাল থেকে ১.০৯ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে
⇨ ১৯০১-১৯৭১ সময়কালের তুলনায় সমুদ্রের পানির স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক হার প্রায় ৩ গুণ বেড়েছে
⇨ শতাব্দীর শেষে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে।
⇨ ২০৫০ সালের মধ্যে অন্তত এক বছর সম্পূর্ণ বরফশূন্য হবে উত্তর মেরু অঞ্চল।

➢ জলবায়ু কূটনীতি (Climate Diplomacy) [***]

জলবায়ু পরিবর্তন ও এর ক্ষতিকর প্রভাব রোধকল্পে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমন্বিত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বে জলবায়ু কূটনীতির (Climate Diplomacy) আগমন ঘটেছে।

বর্তমান পররাষ্ট্রনীতিতে জলবায়ু কূটনীতি ধারণা উদ্ভবের কারণ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য–

ক. জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলো কীভাবে তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে।
খ. ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলো কার্বন নিঃসরণ করে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত করে কীভাবে দায় শোধ করবে।
গ. শিল্পোন্নত দেশগুলোর কৌশল কী হবে।
ঘ. Climate Finance নামের ব্যয়ের খাত কীভাবে নির্ধারিত হবে।

কালে কালে Climate Negotiation এর ফল:

ক. Inter Governmental Panel on Climate Change (IPCC) গঠন?
খ. Green Climate Fund গঠন?
গ. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) গঠন?
ঘ. Climate Change Regilence Fund গঠন?
ঙ. Bali Action Plan on Climate Negotiation গঠন?

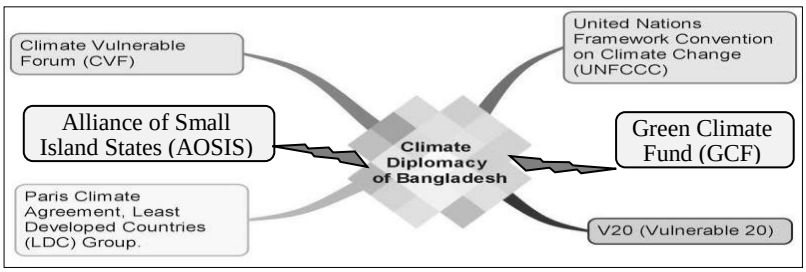

এছাড়াও জলবায়ু কূটনীতি প্রয়োগ করে জলবায়ু চুক্তি, সম্মেলন আয়োজন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হচ্ছে, যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যায়। ২০০৯ সালে 'কপ-১৫' সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠনের জন্য শিল্পোন্নত দেশের জিডিপির ০.৭% অর্থায়ণ করার সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

➢ IPCC: [**]

IPCC বা Inter-governmental Panel on Climate Change হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তঃসরকারি প্যানেল। এর মূল কাজ হচ্ছে মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মূল্যায়ন করা। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের দুটি অঙ্গসংস্থা বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) এবং জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর উদ্যোগে গঠিত হয় IPCC.

➢ প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:

১. মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ নির্ণয় করা।
২. মানব সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।
৩. এ সমস্যা সমাধানে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো এবং সমস্যার কার্যকরী সমাধানের দিক নির্দেশনা প্রদান।
৪. বার্ষিক জলবায়ু প্রতিবেদন প্রকাশ।

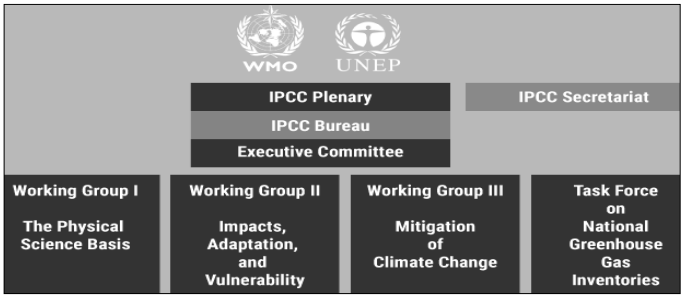

➢ Green Climate Fund [***]

Green Climate Fund একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম হিসেবে বিশ্বব্যাপী কাজ করছে। ২০০৯ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন 'কপ-১৫' এই তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ২০১০ সালে ১৯৪টি দেশের উদ্যোগে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠিত হয়। ২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনে ('কপ-১৭') এই তহবিল কার্যক্রম শুরু করে।

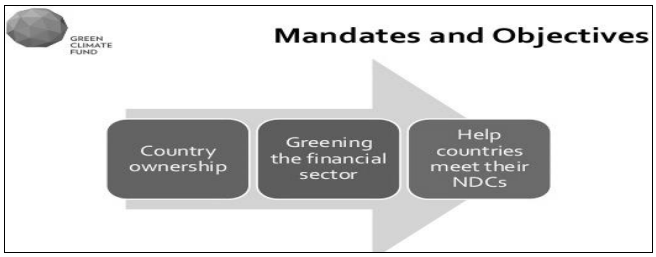

➢ কর্মসূচি:

ক. উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, সেসব সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা।
খ. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গ্রিন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা।
গ. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব দেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে, সেসব দেশের পাশে দাঁড়ানো।

➢ অর্থায়নের উৎস:

Green Climate Fund নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০২৪ সাল নাগাদ একটি লক্ষ্য স্থির করেছে, সেটি হলো ১০০ বিলিয়ন ডলার ফান্ড গঠন করা। অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন গঠন করেন "High Level Advisory Group on Climate Financing (AGF)". ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই তহবিলে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

- ⇨ ২০২১ সাল পর্যন্ত ১৯০টি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে।
- ⇨ ট্রাম্পের আগে যুক্তরাষ্ট্র ১ বিলিয়ন ডলার দিয়েছিল। আরও ২ বিলিয়ন দেয়ার কথা থাকলেও ট্রাম্প তা দেয় নি।
- ⇨ জো-বাইডেন আসার পর ফান্ডে অর্থায়ন করেছে ২ বিলিয়ন ডলার।
- ⇨ বর্তমানে উন্নত দেশের সবাই মিলে ১০-১২ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।
- ⇨ ২০১৯ সালের নভেম্বর নাগাদ মোট ৫.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিলে জমা হয়েছে।
- ⇨ ব্রিটেন, কানাডা, চীন, জার্মানির মতো অর্থনৈতিক পরাশক্তি এই তহবিলে আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি থেকে আংশিক দিয়েছে।
- ⇨ স্বল্পোন্নত দেশের অভিযোজনে ৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ১.৪ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে।
- ⇨ বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ১০০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা পেয়েছে।

➢ Green Economy [**]

সবুজ অর্থনীতি বা Green Economy বলতে পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিকে বুঝায়। অর্থাৎ, পরিবেশের কোনো ক্ষতিসাধন না করে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। সবুজ অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত সব সিদ্ধান্তই পরিবেশের অনুকূলে থাকবে। পরিবেশের প্রতিকূলে গিয়ে কোনো উন্নয়নই সম্ভব নয়, এটাই সবুজ অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য। সবুজ অর্থনীতিতে সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার, কার্বন নির্গমনের হার হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

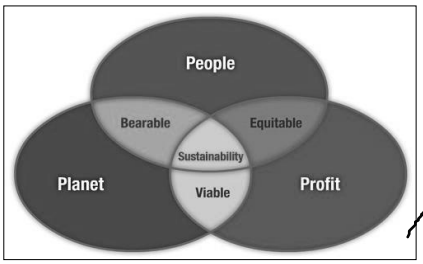

সবুজ অর্থনীতি হলো সেই অর্থনীতি যা মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে এবং সমতা আনবে, কিন্তু পরিবেশগত ঝুঁকি কমাবে এবং পরিবেশগত অভাব দূর করবে।

সবুজ অর্থনীতির উপাদান:

০১. সবুজ জ্বালানি
০২. সবুজ পুঁজি
০৩. সবুজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
০৪. সবুজ ভূমি ব্যবস্থাপনা
০৫. সবুজ পরিবহন
০৬. সবুজ কর্মসংস্থান
০৭. সবুজ পানি ব্যবস্থাপনা
০৮. সবুজ কৃষি।

➢ Green Banking [**]

গ্রিন ব্যাংকিং হলো এক ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বজায় রাখা। অর্থাৎ, গ্রিন ব্যাংকিং হলো পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং।

গ্রিন ব্যাংকিং এর লক্ষ্য:

১. ব্যাংকিং কার্যক্রমে কাগজের ব্যবহার কমানো
২. পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবনে আর্থিক সহায়তা প্রদান
৩. পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান
৪. অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান
৫. আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটা তৈরিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান

গ্রিন ব্যাংকিং এর লক্ষ্য:

১. যথাসম্ভব কাগজের অপচয় এড়াতে সাহায্য করো এবং অনলাইন বা ইলেক্ট্রনিক লেনদেনের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করো। কারণ যত কম কাগজের ব্যবহার হবে তত কম গাছ নিধন হবে।
২. বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, নদী ভাঙ্গন অর্থাৎ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অঞ্চলের মানুষের জন্য কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা।
৩. ব্যাংকের পরিবহন কাজে পেট্রোল, ডিজেল ও অকটেনচালিত গাড়ির বদলে গ্যাসচালিত গাড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

৪. পরিবেশবিরোধী শিল্পে ও ব্যবসায়ী ঋণে সুদের হার কমানো এবং
৫. ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ পরিবেশবান্ধব শিল্প ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা।

➢ অভিযোজন (Adaptation): [**]

অভিযোজন হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানো। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর যে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সে পরিস্থিতি উত্তরণে গৃহীত কৌশলকে জলবায়ু অভিযোজন বলে।
অর্থাৎ জলবায়ু অভিযোজন বলতে বুঝায় জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখার সক্ষমতাকে।
UN Adaptation Committee জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজনের ৩টি পর্যায় চিহ্নিত করেছেন:

১. প্রথম পর্যায়ে, জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করা এবং আমরা এমন কিছু করছি কিনা তা চিহ্নিত করা। এজন্য–

ক. ঝুঁকির সম্মুখীন প্রয়াসগুলো বন্ধ করতে হবে।
খ. প্লাবন ভূমিতে ভাসমান ভবন নির্মাণ করতে হবে।
গ. জলবায়ুর ঝুঁকি কমাতে হবে।
ঘ. পানি, বায়ু ও মাটি দূষণ ঠেকাতে হবে।

২. ২য় পর্যায়ে, আমাদের বর্তমান অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামোগুলোতে বিনিয়োগ করতে হবে। যেমন: সেতু, রাস্তা, বিমানবন্দর এবং নৌবন্দরগুলোর বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
৩. রূপান্তরমূলক অভিযোজনের দিকে নজর দেয়া।

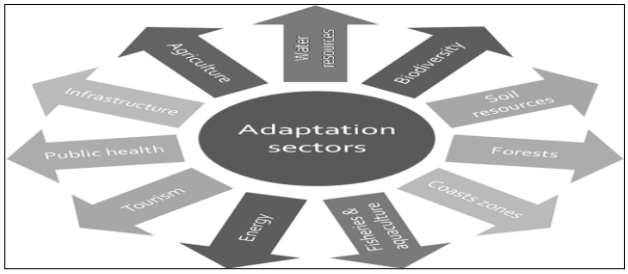

➢ অভিযোজন কৌশলের খাতসমূহ:

ক. পানি	খ. কৃষি	গ. অবকাঠামো	ঘ. জনস্বাস্থ্য	ঙ. যোগাযোগ
চ. শক্তি	ছ. জীববৈচিত্র্য	জ. মাটি	ঝ. বনভূমি	ঞ. পর্যটন

➢ Sustainable Development Goals [***]

১৯৮৭ সালে World Commission on Environment & Development (WCED) কর্তৃক Our Common Future শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশের পর থেকেই মূলত Sustainable Development শব্দটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। রিও সম্মেলনেও প্রচলিত উন্নয়নের ধারণার বিপরীতে টেকসই উন্নয়ন ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। টেকসই উন্নয়নের ধারণায় বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আগামি প্রজন্মে যাতে তাদের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা হারিয়ে না ফেলে তার নিশ্চয়তা বিধান করার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

টেকসই উন্নয়নের ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রা:

২০১৫ সালে জাতিসংঘের ৭০তম সম্মেলনের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ১৫ বছর মেয়াদি টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়। যা ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। লক্ষ্যমাত্রাগুলো হলো-

SDG- 01 : সর্বত্র সবধরনের দারিদ্র নির্মূল করা
SDG- 02 : ক্ষুধা মুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু
SDG- 03 : স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা
SDG- 04 : অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা
SDG- 05 : লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা

SDG- 06 : সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সহজপ্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
SDG- 07 : সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সুবিধা নিশ্চিত করা
SDG- 08 : সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদি, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা
SDG- 09 : দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরি করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন করা এবং উদ্ভাবনে উৎসাহিত করা
SDG- 10 : দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস করা
SDG- 11 : নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলা
SDG- 12 : টেকসই ভোগ উৎপাদন রীতি নিশ্চিত করা
SDG- 13 : জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা
SDG- 14 : টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা
SDG- 15 : পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা, পুনর্বহাল ও টেকসই ব্যবহার করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ রোধ, ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা
SDG- 16 : টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা, এবং সর্বস্তরে কার্যকর করা, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা
SDG- 17 : বাস্তবায়নের উপায়গুলো জোরদার করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জীবিত করা

➢ Rio Conference [**]

১৯৯২ সালে স্টকহোম ঘোষণার ন্যায় রিওডিজেনেরিওতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনেও একটি ঘোষণা গ্রহণ করা হয়। 'পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর ঘোষণা' শিরোনামে এই দলিলে উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কের উপর অধিকতর জোর দেয়া হয়। ঘোষিত নীতিমালা আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ নির্দেশক।

➢ **সিদ্ধান্তসমূহ:**

ক. Agenda-21 কর্মসূচি চালু খ. UNFCCC স্বাক্ষর

☞ Agenda-21: [**]

একবিংশ শতককে পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখার জন্য ১৯৯২ সালের রিও কনফারেন্স থেকে এজেন্ডা-২১ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরিবেশ বিপর্যয়ের ইস্যুগুলো এই কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

এটি একটি ৩০০ পৃষ্ঠার দলিল। ২১ শতকের পৃথিবীকে সামনে রেখে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই নামকরণ করা হয়েছে এজেন্ডা-২১। দলিলটি বাস্তবায়নে ১২৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ রাখা হয়।

Note: বাংলাদেশের ফারাক্কা বাঁধ 'এজেন্ডা-২১' এর অন্তর্ভুক্ত।

সারা বিশ্বের পরিবেশ সমস্যাগুলোকে বিষয়ভিত্তিতে বিন্যস্ত করে সরকারি, বেসরকারি বা ব্যক্তি পর্যায়ে কী কী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন তার রূপরেখা দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য ব্যয়ের (আনুমানিক ১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রতি বছর) ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে। দলিলটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন বর্তমান বিশ্বের পরিবেশ সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত ফলপ্রসু হতে পারে। Agenda-21 বাস্তবায়নের ব্যাপারটির পরিক্ষণের জন্য পরবর্তীতে জাতিসংঘের অধীনে Commission on Sustainable Development, CSD নামক একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। CSD এর সচিবালয় নিউইয়র্কে।

☞ UNFCCC: [**]

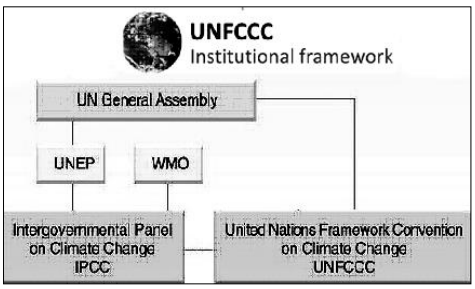

- **পূর্ণ নাম:** United Naitons Franework Convention on Climate Change.
- **লক্ষ্য:** বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবিলা
- **প্রস্তুত হয়:** ০৯ মে, ১৯৯২ নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
- **স্বাক্ষর:** ১৯৯২ সালে ধরিত্রী সম্মেলনে [রিওডিজেনেরিও, ব্রাজিলে]
- **কার্যকর:** ১৯৯৪
- **বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে:** ১৯৯২ এবং অনুমোদন করে ১৯৯৪
- **মূল কাজ:** বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন (COP) আয়োজন
- **উদ্দেশ্য:** জলবায়ু পরিবর্তন ও গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা
- **স্বাক্ষরকারী পক্ষ:** ১৯৭টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন [জাতিসংঘের সদস্য ১৯৩টি+ ফিলিস্তিন+ ভ্যাটিকান+ নিউ দ্বীপপুঞ্জ+ কুক দ্বীপপুঞ্জ+ ইউরোপীয় ইউনিয়ন]

Note: নিউ দ্বীপপুঞ্জ ও কুক দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে নিউজিল্যান্ডের অধীন।

➢ কপ (COP)

জাতিসংঘের বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলনকে আনুষ্ঠানিকভাবে Conference of the Parties, COP নামে পরিচিত। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর কপ আয়োজিত হয়। UNFCCC প্রতিবছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে কপ আয়োজন করে থাকে।

কপ-২৭ (COP-27) এর গুরুত্বপূর্ণ দিক:

COP বা Conference of the Parties জাতিসংঘের উদ্যোগে বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন। ২০০টি দেশের অংশগ্রহণে ২০২২ সালের ৬-১৯ নভেম্বর তারিখে মিশরের শার্ম আল শেখে কপ-২৭ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ দিক:

১. ১৯ শতকের শেষের দিকের মত তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা।
২. ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস ৪৫% হ্রাস করা।
৩. ১৩৪টি উন্নয়নশীল দেশের জন্য Loss & Damage Fund গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৪. ২০৩০ সাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রতি বছর কমপক্ষে ৪ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা যাতে ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্য নির্গমনে পৌঁছতে সক্ষম হওয়া যায়।
৫. বাংলাদেশ ২৭ বছর মেয়াদি জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে, যা বাস্তবায়নে প্রয়োজন হবে ২৩০ বিলিয়ন ডলার। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১০.৩ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদন বেশি হবে এবং ৪০ লাখ প্রান্তিক পরিবারের জীবিকা নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে। পরিবেশবান্ধব যানবাহন চালুর কারণে পরিবহন খাতে ব্যয় কমবে ১০ শতাংশ। প্রায় ১.৫ কোটি লোক অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাবে।
৬. "উন্নয়নশীল দেশগুলোর চাহিদার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের উদ্বেগের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং তদসংশ্লিষ্ট ক্রমবর্ধমান ঋণ, এবং তাদের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদানগুলো বাস্তবায়নের জন্য ২০৩০ সালের আগে প্রায় ৫.৮ থেকে ৫.৯ ট্রিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।"

COP – 26 [***]

৩১ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত স্কটলান্ডের গ্লাসগোতে ২৬তম কপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০টি দেশের প্রতিনিধির পাশাপাশি ১২০টি দেশের সরকারপ্রধান উপস্থিত ছিলেন।

✳ **সিদ্ধান্ত:**

১. ১.৫° এর মধ্যে তাপমাত্রা রাখা।
২. Fossil Fuel বিশেষ করে কয়লা ব্যবহার থেকে সরে আসা।
৩. ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ– ৫০% কমানো
৪. ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ– ০% এ নিয়ে আসা
৫. দরিদ্র দেশগুলোতে সহায়তা বৃদ্ধি করা
৬. ১৯০টি দেশ কয়লা ব্যবহার বন্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
৭. বাংলাদেশ ১২ বিলিয়ন ডলারের ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎপ্রকল্প বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে।
৮. ২০৬০ সালের মধ্যে সিএফসি গ্যাস ০% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% (CH_4 গ্যাস) হ্রাস করার পরিকল্পনা।

✳ **ফলাফল:** ব্যর্থ হয়।

➢ কার্বন কর (Carbon Tax) [**]

কার্বন কর বা কার্বন ট্যাক্স হলো জ্বালানি ব্যবহারের ফলে নির্গত কার্বনের উপর ধার্যকৃত কর বা ট্যাক্স। কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের জন্য তথা পরিবেশ দূষিত করার জন্য জ্বালানি ব্যবহারকারীকে যে ট্যাক্স দিতে হয়, প্রথাগতভাবে তাকেই কার্বন ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করা হয়। '৯০ এর দশকে ফিনল্যান্ড সর্বপ্রথম কার্বন কর চালু করে। এরপর ২০১২ সালে অস্ট্রেলিয়া চালু করে।

☛ **কার্বন কর চালু করার উদ্দেশ্য:**

- ▶ স্বল্প ব্যয়ে কার্বনের নিঃসরণের পরিমাণ কমানো
- ▶ জনগণকে কার্বন সম্পন্ন জ্বালানি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা
- ▶ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে কর থেকে সাহায্য প্রদান করা
- ▶ বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসকরণ
- ▶ গ্রিনহাউস ইফেক্টের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের রক্ষা করা।
- ▶ এই কর আরোপ করা হলে দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়।

➢ কার্বন বাণিজ্য (Carbon Trade): [***]

বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন বাস্তবতা হচ্ছে কার্বন বাণিজ্য। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড কম নিঃসরণের জন্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি ক্রেডিট বিনিময়ের নাম কার্বন বাণিজ্য। অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণ যারা বেশি করে সে দেশগুলো অধিকতর কার্বন নিঃসরণের অধিকার লাভ করে এবং কম কার্বন নিঃসরণকারী রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কার্বন অর্থের বিনিময়ে কিনবে। ফলে অধিক কার্বণ নিঃসরণকারী কার্বন নিঃসরণের দিকে নজর দিবে এবং কম নিঃসরণকারী আরও কম নিঃসরণ করবে।

কার্বন বাণিজ্যের সর্বপ্রথম সূত্রপাত হয় ১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরের পর। সক্ষমতা সত্ত্বেও যে সব কোম্পানি কম দূষণ করে, তারা তাদের অব্যবহৃত দূষণের অধিকার বেশি দূষণকারী কোম্পানির কাছে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন বা বিক্রি করে থাকে। এই প্রক্রিয়া একটি রেগুলেটরি কাঠামোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে, ক্রেতা কোম্পানি বা দেশটি তার ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত সীমার মধ্যে কার্বন নিঃসরণ করছে কি না।

২০১৯ সালের ২৫ জানুয়ারি কার্বন বাজার সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ সাল পর্যন্ত কার্বনের দাম প্রতি টন ৪০ থেকে ৮০ ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি টন কার্বনের দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে।

☛ যেভাবে সূত্রপাত:

১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকলের ১৭ অনুচ্ছেদে ৩৮টি দেশকে ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে তাদের কার্বন নিঃসরণের মাত্রা পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে (১৯৯০) ৫.২% কমানোর সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। এবং বলা হয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ বিষয়ে বাণিজ্য বা যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। মূলত এখান থেকেই কার্বন ট্রেডিং এর সূত্রপাত।

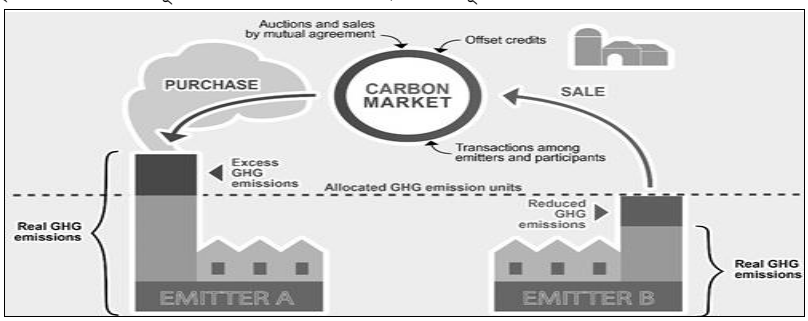

☛ 'কার্বন ট্রেডিং'– মুক্তি নয়, বরং ফাঁদ:

পৃথিবীতে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর জন্য কিয়োটো প্রটোকল একটি আইনগত বাধ্যতামূলক দলিল। এই প্রটোকলে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের একটি নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু ধনী দেশগুলো নিজেদের সুবিধার জন্য Carbon Trading নামে নতুন একটি ধারণার জন্ম দেয়। যাতে শিল্পের অগ্রগতি রোধ না হয়, আবার গ্রিনহাউজ জাতীয় গ্যাসগুলো কম নির্গত হয়।

যেহেতু কার্বন নিঃসরণ একটি সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তাই যে দেশ সীমার চেয়ে কম নিঃসরণ করবে, সেই অনুপাতে তার নামে কার্বন ক্রেডিট জমা পড়বে। আর যারা সীমার চেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করবে, তারা সে ক্রেডিট কিনে নেবে। এ চুক্তির ফলে উন্নত দেশগুলো অর্থের বিনিময়ে তাদের কার্বন নিঃসরণের বৈধতা পাচ্ছে। এতে কার্বন নিঃসরণ কোনোভাবেই কমছে না বরং কার্বন ক্রেডিট কিনে উন্নত দেশসমূহ দায়মুক্তি পাচ্ছে এবং অবাধে কার্বন নিঃসরণ করে যাচ্ছে।

☛ কার্বন বাণিজ্য ও বাংলাদেশ:

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির শীর্ষে থাকলেও বাংলাদেশ এর জন্য দায়ী নয়। কিয়োটো প্রোটোকোলে কার্বন নিঃসরণের যে মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার চেয়েও কম কার্বন নির্গত হচ্ছে। এদেশে আছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়? সুন্দরবন, যার কার্বন শোষণের ক্ষমতা অনেক বেশি। এজন্য সরকার সুন্দরবন ছাড়াও আরো ১১টি বনকে কার্বন বাণিজ্যের আওতায় নিয়ে আসার চিন্তাভাবনা করছে। বিশ্বব্যাংক ও বন বিভাগের সমীক্ষা অনুযায়ী, পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনে রয়েছে ৫ কোটি ৬০ লাখ টন কার্বন।

➢ সমুদ্র দূষণ (Sea Pollution):

সামুদ্রিক দূষণ হলো ক্ষতিকারক বা সম্ভাব্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক, শিল্প কৃষি ও আবাসিক বর্জ্য সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়া। সামুদ্রিক দূষণের শতকরা ৮০ ভাগ ভূমি থেকে আসে। ভূমি থেকে আসা কীটনাশক যখন সামুদ্রিক বাস্তসংস্থানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, সেগুলো দ্রুত সামুদ্রিক খাদ্যের মধ্যে শোষিত হয়ে সামুদ্রিক পরিবেশ দূষিত করে, যার প্রভাব স্থলভাগেও দেখা যায়। সমুদ্রকে দূষিত করে এমন প্রধান জিনিসগুলো হলো–

- ☛ ভূমি থেকে দূষণকারীদের আগমন
- ☛ বায়ুবাহিত ধূলাবালি পড়ে যাওয়া
- ☛ ট্যাংকার এবংঅন্যান্য জাহাজ থেকে বর্জ্য নির্গমন
- ☛ উপকূলীয় জলের তাপীয় দূষণ
- ☛ সমুদ্রের তেজস্ক্রিয় দূষণ
- ☛ বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত দূষণগুলো বৃষ্টিপাতের কারণে সরাসরি সমুদ্রস্তরে পড়ে যাওয়া।

✪ **সমুদ্র দূষণের প্রকারগুলো হল:**

i. **তেল দূষণ:** সামুদ্রিক তেলের দূষণের মূল কারণ হলো ট্যাঙ্কার দুর্ঘটনা এবং ট্যাঙ্কার ধোয়া পানি সমুদ্রে আনলোড করা।

ii. **রাসায়নিক দূষণ:** উপকূলীয় এলাকায় রাসায়নিক কারখানা স্থাপিত হলে তার থেকে নির্গত বর্জ্য সমুদ্রের পানিতে মিশে পানি দূষণ করে।

iii. **কৃষি দূষণ:** কৃষিতে ব্যবহৃত ডিডিটি ও পিসিবি সংশ্লেষ কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রচুর ব্যবহৃত হয়। যা সমুদ্রে মিশে সমুদ্রকে দূষিত করে।

iv. **তেজস্ক্রিয় দূষণ:** পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য তেজস্ক্রিয় যৌগের ব্যবহারের ফলে সমুদ্রের পানিতে তেজস্ক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং সমুদ্র দূষিত হয়।

সমুদ্র দূষণ কনভেনশন:

বর্জ্য ও অন্যান্য বস্তুর নির্গমনের দ্বারা সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধের কনভেনশন হল লন্ডন কনভেনশন ১৯৭২ যা LC72 বা মেরিন জাম্পিং নামেও পরিচিত। ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি ১৯৭৫ সালে কার্যকর হয়।

➢ Paris Agreement-2016:

UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC-এর অধীন ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর হতে ১২ ডিসেম্বর প্যারিসে জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন 'কপ-২১' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের সকল সদস্য দেশ (১৯৬টি দেশ) ও গোষ্ঠীর (ইউরোপীয় ইউনিয়ন) ঐকমত্যের ভিত্তিতে আলোকে জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউইয়র্কে ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল তারিখে একটি চুক্তি গৃহীত হয় যা ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি নামে পরিচিত। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম জলবায়ু চুক্তি।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তির বিষয়বস্তু:

- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম করা।
- গাছ, মাটি ও সমুদ্র প্রাকৃতিকভাবে যতটা শোষণ করতে পারে, ২০৫০ থেকে ২১০০ সালের মধ্যে কৃত্রিমভাবে গ্রিনহাউজ গ্যাসের নিঃসরণ সেই পর্যায়ে নামিয়ে আনা।
- প্রতি ৫ বছর অন্তর ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণ রোধে প্রত্যেকটি দেশের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে গরিব দেশগুলোকে ধনী দেশগুলোর জলবায়ু তহবিল দিয়ে সাহায্য করা।
- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে রাখার প্রচেষ্টা করা।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় ২০২০ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলার অর্থায়ন ও ভবিষ্যতে আরো লাগলে আরো অর্থায়নের অঙ্গীকার।
- যুক্তরাষ্ট্র তার গ্রিনহাউজ গ্যাস ২০২৫ সালের মধ্যে ২৬-২৮ শতাংশ কমিয়ে আনবে।
- জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে আনা।
- কয়লার বিকল্প উৎসে জোর দেওয়া।

প্যারিস চুক্তির দুর্বলতা:

- বিশ্বের সকল সদস্যদেশকে বিশেষ করে শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশসমূহকে এই চুক্তির বাধ্যবাধকতায় আনার জন্য ছাড় দেয়া হয়েছে। যেমন– দেশসমূহ কর্তৃক মধ্যমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস, আর্থিক অন্যান্য সহায়তা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সংখ্যাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।
- বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা স্ব স্ব দেশ কর্তৃক নির্ধারিত হবে, যা পাঁচ বছর পর পর Nationally Determined Contribution এর মাধ্যমে কনভেনশন সচিবালয়ে দাখিল করা হবে এবং তার উপরই বিশ্ব সম্প্রদায়কে নির্ভর করতে হবে। মনিটরিং ত্রুটি।
- উন্নতদেশের প্রবল আপত্তির মুখে Loss & Damage সংক্রান্ত Liablity and Compensation অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
- কোনো দেশ কার্বন নিঃসরণ কমাতে ব্যর্থ হলে তার জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়নি চুক্তিতে।